আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. আমাকে পাগল ভাববেন না 2
২. অনেক কথা বলে ফেলেছি 24
৩. বাসররাতে স্ত্রীকে কী কী কথা বলবে 39
৪. স্বামীর সংসার হাতে নেয়ার প্রবল বাসনা 59
৫. আমাকে খুনি বলছেন কেন 89
৬. আপনি কি শুশুক দেখেছেন 114
৭. জগৎ দুরকমের–বস্তুজগৎ ও মনের জগৎ 125
৮. মূল গল্প থেকে একটু সরে যাই 137
৯. গল্পটা কেমন লাগছে 142

১. আমাকে পাগল ভাববেন না

শুরুতেই আপনি আমাকে পাগল ভাববেন না।

শুরুতে পাগল ভাবলে আমার গল্পটা আপনি মন দিয়ে শুনবেন না। আর শুনলেও তেমন গুরুত্ব দেবেন না। জগতের কোনো মানুষ পাগলদের কথা মন দিয়ে শোনে না। এমনকি সাইকিয়াট্রিস্টরাও না। অথচ পাগলদের কথা তাদেরই সবচে’ মন দিয়ে শোনার কথা। ঠিক না?

সাইকিয়াট্রিস্টরা যে পাগলদের কথা মন দিয়ে শুনেন না–তা কী করে টের পেলাম জানেন? আমার স্ত্রী একবার আমাকে এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেল। সে আগে আমাকে বলে নি কার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু বলেছে তার দূরসম্পর্কের ভাই। আমাদের বিয়ের সময় তিনি দেশে ছিলেন না বলে দেখা হয় নি। এখন দেশে ফিরেছেন। তার সঙ্গে দেখা করা সামাজিক দায়িত্ব।

আমার স্ত্রীর ধারণা ছিল আগে থেকে সাইকিয়াট্রিস্ট বললে আমি হয়তে যেতে চাইব না। যাই হোক, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ভদ্রলোকের বাসায় গেলাম। মধ্যবয়স্ক একজন লোক। প্রচুর টাকা-পয়সা আছে বলে মনে হলো। বসার ঘর সুন্দর করে সাজানো। রেনওয়ার কিছু ছবির সুন্দর রিপ্রডাকশন দামি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। দেখে হঠাৎ করে মনে হবে অরিজিনাল না।

ভদ্রলোক আমাদের যত্ন করে বসালেন। আন্তরিকভাবে কথা বলা শুর করলেন। আমি ছবি নিয়ে কথা বলছি; ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, এক সেকেন্ড একটা জরুরি টেলিফোন করে

আসি, কিছু মনে করবেন না। রাত আটটার টেলিফোন করার কথা। ন'টা বেজে গেছে, আগে খেয়াল করি নি। সরি, সরি।

তিনি টেলিফোন করতে গেলেন, বিশ মিনিট পর ফিরে এসে বললেন তারপর বলুন–আমরা কোথায় ছিলাম যেন?

আমি বললাম, আমরা গত বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে কথা বলছিলাম। জার্মান ফুটবলার বেকেনবাওয়ারকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

ও আচ্ছা, বলুন...।

আমি বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। অথচ আগে ছবি নিয়ে কথা বলছিলাম। প্রসঙ্গ পরিবর্তন ভদ্রলোক ধরতেই পারেন নি, কারণ তিনি গুরুত্ব দিয়ে কিছু শুনছিলেন না।

আমার স্ত্রী আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, কারণ বিয়ের পরপরই তার ধারণা হলো–আমার মাথায় কোনো সমস্যা আছে। এই ধারণা তার হতো না, হয়েছে আমার পারিবারিক ইতিহাসের কারণে। পাগলামির ব্যাপারটা আমাদের পরিবারে আছে। চল্লিশ বছর বয়সে আমার বাবার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়। তার চার বছর পর ঢাকার একটা মেন্টাল হোমে তার মৃত্যু ঘটে। আমার দাদিও পাগল ছিলেন। গভীর রাতে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় আমাদের গ্রামের বাড়ির ছাদে চক্রাকারে দৌড়াতেন। এবং খুবই আনন্দিত গলায় চেঁচাতেন–আমি ন্যাংটা, আমি ন্যাংটা।

আমাদের গ্রামের বাড়িটি পাকা এবং চারদিকে উঁচু দেয়াল। তারপরেও দূর থেকে ছাদের দৃশ্য দেখা যায়। কাজেই আমার দাদা পারিবারিক আব্রু বজায় রাখার জন্যে ছাদের রেলিং অনেক উঁচু করে দিলেন।

এ জাতীয় পারিবারিক ইতিহাসের কারণে আমার স্ত্রী যে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে সেটাই স্বাভাবিক। তার সেই সন্দেহ আরো গাঢ় হলো যখন সে। দেখল, আমার আচার-আচরণ অন্য দশজনের মতো না, খানিকটা আলাদা। যেমন প্রায়ই গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি নিঃশব্দে ছাদে চলে যাই। ছাদে পাটি বিছিয়ে শুয়ে থাকি। তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকার আনন্দ অধিকাংশ মানুষ জানে না বলে তারা এই কাজটা করে না। এর মধ্যে পাগলামি কিছু নেই। অথচ আমার স্ত্রীর ধারণা–আমার মাথা এলোমেলো। মাথা এলোমেলো না হলে কেউ কি তার নবপরিণীতা স্ত্রী ফেলে ছাদে শুয়ে থাকে?

এক রাতে কী হয়েছে শুনুন। আমি ছাদে শুয়ে আছি, নেমেছে বৃষ্টি। কুকুরবেড়াল টাইপ বৃষ্টি। আমাদের ছাদটা ঢাকার রাস্তার মতো, সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায়। আমি নাক ভাসিয়ে পানিতে শুয়ে আছি আমার স্ত্রী এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে সে আঁতকে উঠে বলল, এসব কী হচ্ছে? আমি বললাম, এসো, আমার পাশে শুয়ে পড়।

সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কেন?

আমি বললাম, নাক ভাসিয়ে বৃষ্টির পানিতে শুয়ে থাকলেই বুঝবে–কী হচ্ছে। খুবই মজা হচ্ছে।

সে কী যে অবাক হয়েছিল। তার সেই অবাক দৃষ্টি আমার এখনো মনে আছে। কাউকে অবাক করতে পারলে আমার ভালো লাগে।

বিয়ের পর পর লক্ষ করলাম, আমার স্ত্রী আমাকে খানিকটা ভয় করতে শুরু করেছে। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করছি। মনে করুন, সে আমার জন্যে চা নিয়ে এসেছে। তখন যদি তার নাম ধরে ডাকি সে এমন চমকে উঠবে যে হাত থেকে চায়ের কাপ উল্টে যাবে। কয়েকবার এরকম হয়েছে। একবার তো গরম চা পড়ে হাতে ফোসকা পড়ে গেল।

আমাদের বারান্দাটা অনেক বড়। সেই বারান্দায় আমি একবার একটা দড়ি সিলিং থেকে লাগাচ্ছি। কাজটা করছি চেয়ারে দাঁড়িয়ে। লক্ষ করলাম রূপা (রূপা আমার স্ত্রীর নাম, আপনাকে এখনো মনে হয় তার নাম বলি নি। না বলার কিছু কারণ আছে বলেই বলি নি। কারণটা একটু পরে বলি?) দূর থেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছে। এক সময় সে কাছে এসে বলল, কী করছ? আমি। বললাম, দড়ি ফিট করছি।

কেন?

ফাঁসিতে ঝুলব বলে ভাবছি। আজ দিনটা শুভ। শুক্রবার। ঝুলে পড়ার জন্য। এরচে' ভালো দিন হয় না।

রূপা আঁ আঁ করে বিকট চিৎকার করে ফিট হয়ে পড়ে গেল। আমি তাকে। বলার সুযোগই পেলাম না যে কাজটা করছি একটা দোলনা টানানোর জন্যে। বেতের আসবাবপত্রের দোকানে সুন্দর চেয়ার পাওয়া যায়, যা দড়িতে ঝুলিয়ে দিলে ঝুলন্ত চেয়ার হয়। আমার ধারণা হয়েছিল গল্পের বই নিয়ে ঝুলন্ত চেয়ারে বসতে রূপার ভালো লাগবে।

তখনো আমি বুঝতে পারি নি রূপা আমাকে পুরোপুরি পাগল ধরে নিয়েছে। দড়িটা যে আমি চেয়ার ঝুলানোর জন্যে টানিয়েছি–তা কিছুতেই তাকে বিশ্বাস। করানো গেল না। সে ধরেই নিল আমার মূল পরিকল্পনা ছিল ফাঁসিতে ঝুলা। শেষটায় মত পরিবর্তন করে আমি চেয়ার ঝুলিয়ে দিয়েছি।

আমার জীবনযাপন পদ্ধতি আর দশজন মানুষের মতো না, তা ঠিক। আর দশজন মানুষের মতো না হওয়ার পেছনে যুক্তিও আছে। আর দশটা মানুষ অফিস করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আমি কিছুই করি না। দিন-রাত ঘরে থাকি। দিনরাত যে ঘরে বসে থাকে তার মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার খেলা করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কথায় আছে না—

‘আলসের চোখে কিলবিল করে আইডিয়া
উইপোকা বলে চল ভাই তারে খাই গিয়া।’

আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ধরে ফেলেছেন যে আমার অর্থবিত্ত প্রচুর আছে। আমাদের দেশের খুব কম মানুষেরই গ্রামের বাড়িতে দালান আছে। আমার যে আছে তা তো আগেই বলেছি। সে দালানও দেখার মতো। হুলুস্থুল ব্যাপার। গ্রীক আর্কিটেকচার টাইপ বিশাল বিশাল খাম্বা। আপনি রাজি হলে একবার আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসব। আমার বাবা ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন ভাগ্যবান ব্যবসায়ী। যাতে হাত দিয়েছেন তাই ফুলে ফেপে একাকার হয়েছে। তার বিপুল বিত্তের বড় অংশই তাঁর মাথা খারাপ হবার পর আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে যা পাওয়া যায় তাও কম না। ঢাকা। শহরে দু'টি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স আছে, আমি যার মালিক। ব্যাংকে নগদ অর্থের পরিমাণও কম না। সেই অর্থে যেহেতু হাত দেয়া হয় না, তা দিনে দিনে বেড়ে একটা

হুলুস্থুল অবস্থার সৃষ্টি করছে। হুলুস্থুল' শব্দটা আমি ঘনঘন ব্যবহার করি। কিছু মনে করবেন না। এটা আমার মুদ্রাদোষ। মুদ্রাদোষটা পেয়েছি বাবার কাছ থেকে। তিনি বলতেন– 'হুলুসতুলুস'।

আমি থাকি পুরনো ঢাকায় আমার দাদাজানের আদি বাড়িতে। বাড়িটি ছোট এবং দোতলা, তবে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। গাছ-গাছরায় জঙ্গলের মতো হয়ে থাকে। সেই গাছগুলিতে চারটা বাদর থাকে। বাঁদরগুলির সঙ্গে গল্প করে আমার অনেকটা সময় কাটে।

আমার কথাবার্তা এরা বেশ আগ্রহ নিয়ে শোনে এবং আমার ধারণা এরা। খানিকটা বুঝতেও পারে। মানুষের সঙ্গে আমরা যখন গল্প করি তখন কী হয়? যে শ্রোতা সে কিছুক্ষণ পর পর 'হুঁ' দিয়ে গল্পটা চালিয়ে নিতে সাহায্য করে। আমার বাঁদর-বন্ধুরাও তাই করে। গল্প বলার সময় খানিকক্ষণ পর পর 'হু' জাতীয় শব্দ করে এবং মাথা নাড়ে। এদের সময় দেয়াটাও রূপা আমার পাগলামির প্রকাশ বলেই ধরে নিল। যখন আমি বাঁদরের সঙ্গে গল্প করতাম, সে জানালা দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখত। আমি তাকালেই জানালার পর্দা ফেলে দিত।

বেঁচে থাকার জন্যে যাকে কোনোরকম কাজকর্ম করতে হয় না, তার জীবনযাপন পদ্ধতি একটু আলাদা হবে সেটাই স্বাভাবিক। রূপার কাছে এই স্বাভাবিক ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। সে বাস করতে লাগল ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্যে। আমি তেমন গুরুত্ব দিলাম না। আমার ধারণা ছিল সে দ্রুত আমার আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আমি তার মনের সন্দেহ দূর করার তেমন চেষ্টাও করলাম না, তবে লক্ষ করলাম আমাকে সুস্থ

করে তোলার প্রবল চেষ্টা সে চালাচ্ছে। যেমন, এক রাতে ঘুমুতে যাবার সময় সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, এই ট্যাবলেটটা খেয়ে ঘুমাও।

আমি বললাম, কী ট্যাবলেট?

ফ্রিজিয়াম। খেলে আরামে ঘুমুবে। এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যাবে।

আমার ঘুমের তো কোনো সমস্যা নেই। আমি এক ঘুমেই রাত কাবার করে ফেলি। শুধু রাত না, দিনেরও খানিকটা অংশ কাবার করি। সকাল নটার আগে ঘুম থেকে উঠি না। কাজেই তুমি নিশ্চিত থাকতে পার যে আমার ঘুমের কোনো সমস্যা নেই।

সমস্যা আছে। প্রায়ই তুমি রাতে ছাদে শুয়ে থাক।

ঘণ্টাখানিক বা ঘণ্টা দুই শুয়ে থাকি। তাতে আমার কোনো অসুবিধা তো হয়। দিনে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেই।

প্লিজ খাও না।

আমাকে ট্যাবলেট খাওয়ানোর বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে? তোমার বড় আপা?

রূপা চুপ করে রইল। তার মানে রূপার বড় বোন সাথী এই কাণ্ড করেছে।

রূপারা তিন বোন। বড় বোন ডাক্তার। মিটফোর্ড হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। সবচে' ছোটটিও ডাক্তার হবার চেষ্টায় আছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। রূপা পড়েছে ইংরেজি

সাহিত্য। এরা নিতান্তই মধ্যবিত্ত পরিবারের। বাবা পোস্টাল সার্ভিসে ছিলেন। বর্তমানে রিটায়ার করেছেন। মালিবাগে তাদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি আছে। যার দোতলাটা ভাড়া। সংসার চলছে পেনশনের টাকায় এবং বাড়ি ভাড়ার টাকায়। বিয়ের পর ঐ বাড়িতে আমি মাত্র দু'বার গিয়েছি। তৃতীয়বার যাবার রুচি হয় নি। ওরাও আমাকে নিতে চায় নি। সম্ভবত রূপার মতো তাদের পরিবারের সবার ধারণা আমি উন্মাদ বিশেষ। শেষবারের মতো যখন ও বাড়িতে গেলাম, আমার শ্বশুরসাহেব সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে রইলেন। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাবার সময় দর্শকরা সাপের দিকে যেমন চোখে তাকায়, শ্বশুরসাহেবের দৃষ্টিও সে-রকম। তিনি অনেক ইতস্তত করে বললেন, বাবা, তুমি শুনলাম দিনরাত বাড়িতে থাক। কখনো বের হও না...।

আমি বললাম, ঠিকই শুনেছেন। বাইরে বেরুবার প্রয়োজন হয় না বলে বের হই না। তা ছাড়া ভিড় হৈচৈ আমার পছন্দ হয় না। মাথা ধরে যায়।

তবু লোকজনের সঙ্গে মিশলে মন প্রশান্ত থাকে। আমার মন প্রশান্তই আছে।

তা ঠিক। অবশ্যই ঠিক–তবে জানো কি বাবা, বাইরে ঘোরাঘুরি করলে শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাতে রাতে সুন্দ্রিা হয়। সুন্দ্রিা আমাদের জন্যে প্রয়োজন।

আমার দ্রিা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, আমার সুদ্রিা হয়।

রূপা বলছিল রাতে তুমি ছাদে বসে থাক।

ঠিক বলে নি। রাতে ছাদে অল্প কিছু সময় কাটাই। তাও বসে থাকি না। শুয়ে থাকি।

কেন?

এমনি। কোনো কারণ নেই।

রূপা বলছিল তুমি না-কি বাঁদরের সঙ্গে কথা বলো।

মাঝে মাঝে বলি।

কী কথা বলো?

নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলি না। যখন যা মনে আসে বলি।

ও আচ্ছা।

আপনি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চান?

না।

আমার শ্বশুরসাহেব পুরোপুরি ঝিম মেরে গেলেন। তাঁর ঝিমন্ত ভাব আরো বাড়াবার জন্যে বললাম, শ্রোতা হিসেবে বাদর খুব ভালো।

শ্বশুরসাহেব বিড়বিড় করে বললেন, তাই না-কি?

আমি বললাম, জি। এরা খুব মন দিয়ে কথা শোনে।

শ্বশুরসাহেব ঝিম ধরা গলায় বললেন, ও আচ্ছা। ভালো।

কর্মহীন মানুষ নিজেদের ব্যস্ত রাখার জন্যে নানান ধরনের কাজ খুঁজে বের করে। আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে আমি অনেক কিছুই করতাম। বাঁদরের সঙ্গে গল্প করার কথা তো আগেই বলেছি। আমার অফুরন্ত অবসরের একটা বড় অংশ বই পড়ে কাটত। তার পরেও হাতে প্রচুর সময়। এই সময়টা একেক সময় একেক কাজে লাগাতাম। বাইরের মানুষের। কাছে এই কাজগুলিকে পাগলামি মনে হতে পারে। রূপার তাই মনে হতো। হয়তোবা আপনারও তা মনে হবে। একটা উদাহরণ দেই–একবার বইয়ে। পড়লাম ইউপাস ট্রির কথা। অতি বিষাক্ত গাছ। মাত্র আড়াই ফুট লম্বা হয়। পাওয়া যায় জাভা দ্বীপে। গাছগুলি এতই বিষাক্ত যে এ গাছ যেখানে জন্মায় তার আশপাশের দু'মাইলের ভেতর কোনো বড় গাছ তো দূরের কথা, ঘাসও জন্মাতে পারে না। জীবজন্তু, পশুপাখি কেউ এর ধারে কাছে আসতে পারে না। বিষের জ্বালায় মৃত্যুবরণ করে। এই গাছের চারপাশ ধুধু মরুভূমি হয়ে যায়।

আমার মাথায় খেয়াল চাপল এরকম গাছ একটা পাওয়া গেলে কেমন হয়! খোঁজ-খবর করে জানলাম সেটা সম্ভব নয়। ভাবলাম পরিচিত কোনো গাছকে বিষাক্ত করা যায় না? কিছুদিন সেই চেষ্টা চলল, নানান জাতের বিষ এনে পানিতে গুলে টবে রাখা গাছে দিয়ে দি। দিন চারেকের মধ্যে গাছগুলি মরে যায়। মানুষের জন্যে ক্ষতিকর বিষ দেখা গেল গাছের জন্যেও ক্ষতিকর। সেখান থেকে মাথায় চিন্তা এলো–গাছকে পানির বদলে মানুষের রক্ত দিলে কেমন হয়? এতে গাছের কি কোনো পরিবর্তন হবে? যদি হয় তাহলে কী

জাতীয় পরিবর্তন হবে? সমস্যাটা নিয়ে বেশ কিছু দিন ভাবলাম। দেখা গেল মানুষের রক্ত দেয়ার কিছু সমস্যা আছে। প্রধান সমস্যা, রক্ত জমাট বেঁধে যায়। জমাট বাঁধা রক্ত পানির মতো মাটির ভেতর যেতে পারে না। দ্বিতীয় সমস্যা, রক্ত পাব কোথায়? দু'টি সমস্যারই সুন্দর সমাধান বের করলাম। ব্লাডব্যাংকের রক্ত। টাকা দিয়ে কিনলেই হয়। এই রক্ত প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা থাকে। এন্টিকোয়াগুলেন্ট দেয়া থাকে বলে রক্ত জমাট বাঁধে না। টাকা এবং যোগাযোগ থাকলেই এই রক্ত পাওয়া কোনো সমস্যা নয়। দুটোই আমার আছে।

রক্তের এক লিটারের দশটি ব্যাগ কিনে আনলাম। টবে পোতা একটা। পেয়ারা গাছের গোড়ায় রোজ এক লিটার করে বি পজিটিভ রক্ত দেই। তৃতীয়। দিনের দিন রূপা জিজ্ঞেস করল, এইসব কী?

আমি বললাম, রক্ত। মানুষের রক্ত।

রূপা হতভম্ব গলায় বলল, রক্ত গাছে দিচ্ছ কেন?

দেখছি–গাছের কোনো পরিবর্তন হয় কি-না।

রূপার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তুমি অসুস্থ। তুমি অসুস্থ।

আমি মোটেই অসুস্থ না। তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ।

রূপা বলল, তুমি ভয়ঙ্কর অসুস্থ। এবং তুমি তা জানো না।

আমি রূপাকে কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে আমি মোটেই অসুস্থ নই। মানুষ হিসেবে আমি বুদ্ধিমান এবং দয়ালু।

রূপা বলল, আমার মনে হয় না, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে পারব।

আমি বললাম, তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে বাস করতে পারবে। তোমার কোনো সমস্যাই হবে না।

এই পরীক্ষা যদি বন্ধ না কর, আমি থাকব না।

আমি পরীক্ষা বন্ধ করে দিলাম। রূপা চলে যাবে এই ভয়ে যে বন্ধ করলাম তা না। পঞ্চম দিনের দিন গাছটা মরে গেল। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, গাছটা চতুর্থ দিনে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল–পাতাগুলি হয়েছিল নীলচে এবং কাণ্ডটা হয়ে গেল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের। রক্তের কারণে যে গাছ মরে গেছে তা কিন্তু না। বরং গাছটাকে অনেক বেশি সজীব লাগছিল। গাছটা মারা গেল পিঁপড়ার আক্রমণে। রক্তের লোভে ঝাকে ঝাকে পিঁপড়া এসে গাছটাকে আক্রমণ করল। গাছের শিকড় কেটে লণ্ডভণ্ড করে দিল।

আমি ঠিক করলাম এই পরীক্ষাটা আমি আবার করব। এইবার করব এমনভাবে যেন পিপড়া গাছ আক্রমণ করতে না পারে। টমেটো গাছ নিয়ে পরীক্ষা করা হবে। কনট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট। আটটা গাছ থাকবে। চারটায় পানির বদলে রক্ত দেয়া হবে। চারটায় পানি। টমেটো হবার পর খেয়ে দেখা হবে–টমেটোর স্বাদের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি-না।

গাছের পরীক্ষার পর পর রূপা আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেল, যে কথা আপনাকে শুরুতে বলেছি। ভদ্রলোক নানান প্রশ্ন-ট্রশ্ন করলেন। খুব চালাকি ধরনের প্রশ্ন, যাতে আমি বুঝতে না পারি ব্যাপারটা কী। আমি প্রতিটি প্রশ্নের এমন জবাব দিলাম যে ভদ্রলোক মোটামুটি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের প্রশ্নের এবং আমার উত্তরের কিছু নমুনা দেই।

প্রশ্ন : আপনি কি দুঃস্বপ্ন দেখেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : প্রতি রাতেই দেখেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : একই দুঃস্বপ্ন ঘুরে ফিরে দেখেন, না একেকদিন একেক দুঃস্বপ্ন?

উত্তর : একই দুঃস্বপ্ন ঘুরে ফিরে দেখি।

প্রশ্ন : কী দেখেন?

উত্তর : দেখি আমি মাছ কুটছি। মাছটা পরিচিত মনে হচ্ছে। আমি খুব চিন্তিত–মাছ আবার পরিচিত হবে কী করে? ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। এটা আসলে মাছ না। আমি একটা মানুষকে কেটে কুচি কুচি করছি। সেই মানুষটা আর কেউ না, আমি নিজে। আমি খুব ঘাবড়ে যাই। তারপর রান্না চড়াই। নিজেকেই নিজে রান্না করি। তারপর খেতে বসি।

নিজেকেই নিজে খাই। খেতে গিয়ে দেখি টেস্ট পাচ্ছি না। রান্না ভালো হয় নি। লবণ বেশি হয়েছে।

প্রশ্ন : আমার মনে হচ্ছে এই স্বপ্নটা আপনি বানিয়ে বানিয়ে বললেন।

উত্তর : ঠিক ধরেছেন।

প্রশ্ন : এটা কেন করলেন?

উত্তর : খুব অদ্ভুত কিছু দুঃস্বপ্ন আমি দেখতে চাই কিন্তু দেখতে পারি না। সাধারণ দুঃস্বপ্ন দেখি। এই জন্যেই মাঝে মাঝে আমি দুঃস্বপ্ন কল্পনা করি।

প্রশ্ন : সাধারণ দুঃস্বপ্ন বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

উত্তর : সেটা আপনাকে বলব না ভাই। বললে আপনি হাসবেন।

প্রশ্ন : আপনি কি অন্ধকারকে ভয় পান?

উত্তর : না, পাই না। আলো ভয় পাই।

প্রশ্ন : আলো ভয় পান মানে?

উত্তর : দিনের বেলা কেমন জানি ভয় ভয় করে। সূর্য ডোবার পর ভয়টা কেটে যায়।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী বলছিলেন আপনি বাঁদরের সঙ্গে কথা বলেন। এটা কি সত্যি?

উত্তর : অবশ্যই সত্যি। সে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে কেন? রূপা মিথ্যা কথা বলার মেয়ে না।

প্রশ্ন : বাদরের সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলেন?

উত্তর : বেশিরভাগ সময় জোকস বলি। এরা জোকস ধরতে পারে। হাসে।

প্রশ্ন : বাঁদর হাসে?

উত্তর : অবশ্যই হাসে। বাঁদরের সঙ্গে মানুষের মিল সবচে' বেশি, ওরাও মানুষের মতো কাঁদে এবং হাসে। বাঁদরের হাসি খুবই অদ্ভুত। এরা শরীর দুলিয়ে হাসে। হাসার সময় একজন আরেকজনের গায়ে ধাক্কা দেয়। বাঁদরের হাসি কখনো শুনেছেন?

সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, না।

আমি বললাম, শুনতে চান?

তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনতে চাই।

আমি বললাম, তাহলে কোনো একদিন আমার বাসায় চলে আসুন। আমি আপনাকে বাঁদরের হাসি শুনিয়ে দেব।

ভদ্রলোক বললেন, অবশ্যই আসব। আমার ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। সে মজা পাবে।

আমি বললাম, ভাবিকেও সঙ্গে নিয়ে আসুন। উনিও মজা পাবেন। জন্তুদের কাণ্ডকারখানা দেখলে মহিলারাই সবচে বেশি মজা পান।

সাইকিয়াট্রিস্ট বুঝতেও পারলেন না যে আমি এখন প্রশ্ন করা শুরু করেছি এবং তিনি উত্তর দিচ্ছেন। পাশার দান উল্টে গেছে।

আমি : বাঁদর ছাড়াও আরো একটা প্রাণী হাসতে পারে, তার নাম জানেন?

সাইকিয়াট্রিস্ট : না।

আমি : প্রাণীটার নাম বাঘ। জিম করবেট তার শিকারের বইয়ে বাঘের হাসির কথা বলেছেন। রানীক্ষেতের মানুষখেকো বাঘিনীর অংশে লেখা আছে। জিম করবেট পড়েছেন?

সাইকিয়াট্রিস্ট : না।

আমি : জিম করবেটের নাম শুনেছেন?

সাইকিয়াট্রিস্ট : না।

আমি : জিম করবেট পড়তে চাইলে আমি আপনাকে দিতে পারি। আমার লাইব্রেরিতে আছে। দেব এনে?

সাইকিয়াট্রিস্ট : আচ্ছা।

কথাবার্তার শেষে ভদ্রলোক আমাকে এক গাদা ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিলেন। বিছানাতে যাবার এক ঘণ্টা আগে দু'টা করে ট্যবলেট খেতে হবে।

আমি বললাম, ভাই, আমার তো ঘুমের কোনো সমস্যা নেই। বিছানায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি। ইচ্ছা-মৃত্যুর মতো আমার হলো ইচ্ছা-ঘুম। ঘুম আমার সমস্যা না।

তিনি বললেন, সমস্যা না হলেও খাবেন।

আমি বললাম, আপনি যখন খেতে বলছেন তখন অবশ্যই খাব।

আপনার নার্ভ যাতে ঠাণ্ডা থাকে, নিউরোলজিক্যাল কানেকশানসে যেন গণ্ডগোল না হয় তার জন্যে এই ওষুধগুলি দিয়েছি।

আমি বললাম, থ্যাংক য়্যু।

ডাক্তার সাহেব বললেন, আমি আমার মোবাইলের একটা নাম্বার দিচ্ছি। যে-কোনো সমস্যায় টেলিফোন করবেন। আমি কখনো মোবাইল অফ করি না।

রাতেও টেলিফোন করতে পারব?

অবশ্যই পারবেন।

গভীর রাতে টেলিফোন করলে বিরক্ত হবেন না তো?

কী আশ্চর্য কথা, বিরক্ত হবে কেন?

রাতে ঘুম ভেঙে টেলিফোন ধরতে হলে অনেকেই বিরক্ত হন। সবচে’ বেশি বিরক্ত হন ডাক্তাররা।

আমি কখনো বিরক্ত হই না। কারণ পেশেন্টের কথা শোনা আমার ডিউটি।

দ্রলোক সত্যি সত্যি বিরক্ত হন কি-না তা দেখার জন্যে আমি সেই রাতেই টেলিফোন করলাম (সময় দু’টা দশ মিনিট)।

অনেকবার রিং হবার পর ভদ্রলোক টেলিফোন ধরলেন। ঘুম ঘুম গলায় বললেন, কে?

আমি বললাম, ভাই, আমার নাম ফখরুদ্দিন চৌধুরী। আজ সন্ধ্যায় রূপা আমাকে নিয়ে আপনার বাসায় গিয়েছিল। রূপা অবশ্যি বলেছিল আপনি তাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। এখন বুঝতে পারছি ঘটনা তা না। আপনি একজন পাগলের ডাক্তার।

পাগলের ডাক্তার এ ধরনের কথা বলবেন না। পাগল বলে কিছু নেই। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে পাগল বলা সামাজিক অপরাধ।

সরি।

বলুন কী ব্যাপার? এত রাতে টেলিফোন করেছেন কেন? সমস্যা কী?

আপনি বলেছিলেন আমি যে-কোনো সময় আপনাকে টেলিফোন করতে পারি। আপনি বিরক্ত হবেন না।

কী জন্যে টেলিফোন করেছেন কাইন্ডলি বলুন। ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরেছি।

ঘুম-বিষয়ক একটা প্রশ্ন ছিল।

কী প্রশ্ন?

মানুষের জন্যে ঘুমের ওষুধ আছে। গাছের জন্যে কি এ ধরনের ওষুধ আছে?

কী বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না।

এমন কোনো ওষুধ কি আছে যা খেলে গাছ ঘুমিয়ে পড়ে? গাছ যে ঘুমায় তা আমরা জানি। কিছু কিছু গাছ যেমন তেঁতুল সন্ধ্যাবেলায় পাতা বন্ধ করে দেয়। আমি জানতে চাচ্ছি এমন কোনো ওষুধ কি আছে যা খেলে দিনেদুপুরে গাছ ঘুমিয়ে পড়বে?

এইটাই আপনার প্রশ্ন?

জি।

এই প্রশ্ন করার জন্যে রাত দু'টার সময় টেলিফোন করেছেন?

জি।

আমি এই প্রশ্নের জবাব জানি না।

বলেই ভদ্রলোক টেলিফোন লাইন কেটে দিলেন।

আমি রাত সাড়ে তিনটার দিকে আবার টেলিফোন করলাম। আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোক টেলিফোন ধরবেন না। মোবাইলে আমার নাম্বার দেখেই সাবধান হয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি ধরলেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ভাই, ভালো আছেন?

তিনি জড়ানো গলায় বললেন, কে?

আমার নাম ফখরুদ্দিন। রূপার সঙ্গে সন্ধ্যায় আপনার বাসায় গিয়েছিলাম।

কী ব্যাপার?

একটা প্রশ্ন ছিল।

আপনি দয়া করে ঘুমুতে যান।

প্রশ্নটার উত্তর জানার জন্যে মনের ভেতর খুঁতখুঁতানি তৈরি হয়েছে। ওটা দূর। হলে ঘুম আসবে না।

কী প্রশ্ন বলুন।

গাছ-বিষয়ক একটা প্রশ্ন। গাছের জীবন আছে এটা তো আমরা জানি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন পাগল হয়ে যায়, গাছের বেলায় কি সে-রকম হতে পারে? আমবাগানের একটা আম গাছ পাগল হয়ে গেল–এরকম। দশটা আম গাছ ভালো, একটা আম গাছ বদ্ধ উন্মাদ। কিংবা আপনাদের পরিভাষায় মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।

ভদ্রলোক টেলিফোন অফ করে দিলেন। রাত চারটার দিকে আবার করলাম, তখনো টেলিফোন অফ। ভোর পাঁচটায় করলাম, তখনো অফ। রবার্ট ব্রুসের মতো অসীম ধৈর্যে আমি টেলিফোন করেই যেতে থাকলাম। এক সময় না এক সময় তিনি তার মোবাইল অন করবেন, তখন যেন তার সঙ্গে কথা বলা যায়।

সকাল সাড়ে নটায় তিনি টেলিফোন ধরলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, কে?

আমি বললাম, ভাই, আমার নাম ফখরুদ্দিন চৌধুরী। রূপাকে নিয়ে গতকাল সন্ধ্যায়...

বাক্য শেষ করার আগেই ভদ্রলোক টেলিফোন লাইন কেটে দিলেন। সারাদিনে তিনি আর টেলিফোন চালু করলেন না। আমি অবশ্যি সারাদিনই চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কর্মহীন মানুষদের ধৈর্য ভালো হয়। যে-কোনো তুচ্ছ কাজে তারা লেগে থাকতে পারে। এরা খুব ভালো বর্শেল হয়। ছিপ ফেলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে পারে। পুকুরে মাছের ঘাই শুনে বলে দিতে পারে–কী মাছ, কত বড় মাছ।

কর্মহীন মানুষ বার্ডওয়াচার হয়। দুরবিন হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। মা-পাখি শিশুদের খাওয়াচ্ছে। দিনে ক'বার খাওয়াচ্ছে, কী খাওয়াচ্ছে সব তারা জানে। তাদের যদি জিজ্ঞেস করেন, বলুন তো দেখি, একশ্রেণীর বক আছে যাদের থুতনিতে ছাগলের দাড়ির মতো দাড়ি। দাড়িওয়ালা বকদের নাম কী? তারা সঙ্গে সঙ্গে বলবে নাম–মেছো বক।

এরা আমার মতো বইপড়া জ্ঞানী হয়। রাজ্যের বই পড়ে পড়ে মাথার স্মৃতিকোষ অর্থহীন জ্ঞানে বোঝাই করে রাখে। কেউ দর্শনের বই পড়ে পড়ে হয়। দার্শনিক। কেউ গাছপালার বই পড়ে পড়ে শখের বোটানিস্ট। ইউনিভার্সিটির পাস করা বোটানিস্টকে যদি জিজ্ঞেস করেন–আচ্ছা স্যার, ভুইআমলা গাছের নাম জানেন? তাঁরা ভুরু কুঁচকে বলবেন–ভুইআমলা? দেশী গাছ? সাইন্টিফিক নাম কী বলুন তো?

একজন শখের স্বশিক্ষিত বোটানিস্টকে জিজ্ঞেস করুন; তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বলবেন-ও আচ্ছা, ভূমিআমলা–ভূমি আমলকির কথা বলছেন? কেউ কেউ আবার একে বলেন ভুধাত্রী। অন্য আরেকটা নাম আছে–তমালিকা। Euphorbiaceae পরিবারের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম Phyllanthus freteratus. কেন চিনব না?

২. অনেক কথা বলে ফেলেছি

আপনাকে অনেক কথা বলে ফেলেছি। এখন আপনার কী ধারণা হচ্ছে? আমি পাগল? না-কি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পছন্দ করে এমন কেউ?

পাগলরাও কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করে মজা পায়। তারা নিজেরা বিভ্রান্ত বলেই অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আমার এক বন্ধু ইসলামিয়া কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো তিনি ইজিচেয়ারে বসে পান খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই মোটামুটি আনন্দিত গলায় বললেন, খবর শুনেছ? আমি

তো পাগল হয়ে গেছি। ব্রেইন পুরোপুরি কলাপস করেছে।

আমি বললাম, তাই নাকি!

তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, হ্যাঁ ঘটনা সে-রকম। আমার ফ্যামিলির লোকজন অবশ্যি আসল কথা ফাঁস করছে না। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে আমার সামান্য মাথা গরম হয়েছে। আমি তো জানি ঘটনা কী।

ঘটনা কী?

ঐ যে বললাম, পাগল হয়ে গেছি। লক্ষণ কী জানতে চাও?

জানতে চাই।

ঘটনা হলো–সারাক্ষণ আমার পেটে কে যেন কথা বলে। অর্ধেক বোঝা যায়, অর্ধেক যায় না। আমার পেটে কান রাখলে তুমিও শুনতে পাবে। এসো, শুনে দেখ।

বলেই তিনি পাঞ্জাবি উপরে তুলে পেট বের করলেন। তিনি যা করলেন তা হলো–আমাকে বিভ্রান্ত করলেন। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমার মনে হলো–সত্যি সত্যি কেউ বোধহয় তার পেটে কথা বলছে।

রূপার সঙ্গে কীভাবে আমার বিয়ে হলো সেই গল্প শুনবেন, না-কি আমার বাড়িতে ভূতের উপদ্রবের গল্পটা শুনবেন? আমি দুটাই বলব। কোনটা আগে শুনতে চান? ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে ভূতেরটা আগে বলতে হয়, তবে ইন্টারেস্টিং বেশি বিয়েরটা। ভূত এবং বিয়ে আমার বেলায় সম্পর্কিত। ফিজিক্সে প্রথমে Cause তারপর Effect. আমার বেলায় ভূতটা Cause, বিয়ে হলো Effect.

ঠিক আছে, ভূত দিয়েই শুরু করি। যদিও ভূতের গল্পটা এখন করতে চাচ্ছিলাম না। ভূতের গল্প যত ভয়ঙ্করই হোক, দিনের বেলা পানসে লাগে। শুধু পানসে না, হাস্যকরও লাগে। যিনি দিনের বেলায় আগ্রহ নিয়ে ভূতের গল্প করেন, সবাই তার দিকে মজা পাওয়া চোখে তাকিয়ে থাকে। যেন সে ভূতের গল্প বলছে। না, জোকস বলছে। খুব সিরিয়াস জায়গায় নিজেকে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মনে করেন, এমন শ্রোতা সবাইকে হাসানোর জন্যে বলে বসেন–তারপর ভূতটা কী করল? আপনার সঙ্গে কোলাকুলি করল? যিনি ভূতের গল্প করছেন তিনি তখন রেগে যান। তিনি যতই রাগেন অন্যরা ততই মজা পায়। এই মজাটা আমি আপনাকে দিতে চাচ্ছিলাম না।

যাই হোক, ভূত প্রসঙ্গটা দ্রুত শেষ করে বিয়ের প্রসঙ্গে আসি। এক শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষার দুপুরে আমি ভূত দেখলাম। সরি, একটু ভুল হয়েছে–ভূতের কথা শুনলাম। ঘটনাটা বলি। দুপুরের খাওয়া শেষ করে বই হাতে নিয়ে বিছানায় গিয়েছি। সরি, আবারো ভুল করেছি। বই না, ম্যাগাজিন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি। দুপুরের খাবার পর আমি ম্যাগাজিন পড়ি। রাতে পড়ি বই। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে তুন্দ্রা অঞ্চলে বিপন্ন পেঙ্গুইনদের উপর একটা লেখা পড়ছি। সুন্দর সুন্দর ছবি। ছবিগুলি দেখতে ভালো লাগছে। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বিছানায় চাদর নেই বলে গায়ে চাদর দিতে পারছি না। চাদর বের করে দেবার জন্যে কাউকে ডাকতে হবে। বিছানায় শুয়ে ডাকলে হবে না, আমাকে দোতলা থেকে একতলায় নামতে হবে। কারণ আমার কোনো কাজের লোকের দোতলায় উঠার হুকুম নেই। দোতলাটা আমার একার।

যে চাদরের উপর শুয়ে আছি তারি অর্ধেকটা নিজের উপর দিয়ে পড়তে শুরু করলাম। আর্টিকেলের শুরুটা করেছে চমৎকার। জন স্টেইনবেকের উপন্যাসের নাম দিয়ে প্রবন্ধের শুরু–It was a winter of discontent.

বাক্যটা শেষ করা মাত্র পরিষ্কার মেয়েলি গলায় একজন কেউ বলল, কী পড়েন?

আমি বই নামিয়ে বললাম, কে?

তার উত্তরে নারীকণ্ঠ সামান্য হেসে আবারো বলল, কী পড়েন?

এর মধ্যে আমি দেখে নিয়েছি যে ঘরে কেউ নেই। ভয় পাই নি খুবই বিস্মিত হয়েছি। তবে অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, কে কথা বলে?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ একজন হালকা করে নিঃশ্বাস ফেলল। জবাব দিল। আমি দীর্ঘ রচনাটা পড়ে শেষ করলাম। কোনো কথাবার্তা শুনলাম না। পর পর দু'টা সিগারেট টেনে ঘুমুতে গেলাম। ভালো ঘুম হলো। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস। বাতাসে জানালা নড়ছে। খটখট শব্দ হচ্ছে। খুবই বিরক্তি লাগছে। বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ঘুমটা পুরোপুরি কাটে নি। আরো কিছুক্ষণ ঘুমানো যায়। এই সময় দুপুরের নারীকণ্ঠ আবার শুনলাম। সে মধুর গলায় বলল, আর কত শুয়ে থাকবেন?

দুপুরের নারীকণ্ঠের কথা কিছুই মনে ছিল না। হঠাৎ সবটা এক সঙ্গে মনে পড়ল। আমি হতভম্ব গলায় বললাম, একী! বিছানা থেকে নামলাম। হাত-মুখ ধুলাম। এবং খুবই স্বাভাবিকভাবে এক তলায় চলে গেলাম। রফিক সঙ্গে সঙ্গে মগভর্তি চা নিয়ে এসে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, স্যারের কি শরীর খারাপ? আমি বললাম, না, শরীর ঠিক আছে। তার চোখ থেকে উদ্বিগ্ন ভাব দূর হলো না। রফিক আমার সঙ্গে আছে প্রায় বার বছর। বার বছর দু'জন মানুষ পাশাপাশি থাকলেই একজন আরেকজনের জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করে। এটা জগতের অনেক গুরুত্বহীন সাধারণ নিয়মের একটি। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, রফিক, আমাদের বাড়িতে কি ভূত আছে?

রফিক সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি স্যার আছে।

তুমি কখনো দেখেছ?

জি।

ভূতটা কী করে?

কিছু করে না। হাসে কান্দে। ছাদে হাঁটাহাঁটি করে। মসলা পিষে।

মসলা পিষবে কেন? ভূতের কি রান্নাবান্না করার কোনো ব্যাপার আছে?

রফিক জবাব দিল না। ভীত মুখ করে দাড়িয়ে রইল। আমি চিন্তিত বোধ করলাম না, কারণ চিন্তিত বোধ করার কিছু নেই। আমার যা হচ্ছে তার নাম। হেলুসিনেশন। অডিটরি হেলুসিনেশন। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের এরকম হয়। খুব সম্ভব আমি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী। রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। আমি সম্ভবত নিউরোসিস পর্যায়ে আছি। রোগ বাড়তে দিলে সাইকোসিস পর্যায়ে চলে যাব। তখন আর কিছু করার থাকবে না। সাইকোসিস পর্যায়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারখানা ঘটতে থাকবে। তার আগেই কোনো একটা ব্যবস্থা নেয়া উচিত। নিওরোসিস এমন কোনো ব্যাপার না। পৃথিবীর বিশ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ভাবে নিওরোসিসের রোগী। এই রোগ মাথায় নিয়ে বাস করা যায়। বারমেসে সর্দির মতো বারমেসে হালকা নিওরোসিস।

এই মুহূর্তে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে ছুটে যাবার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। নিজের চিকিৎসা আমাকে নিজেকেই করতে হবে। দোতলায় বাস করতে পারবে। এমন কাউকে আমার প্রয়োজন। বইপত্রে যতদূর পড়েছি অডিটরি হেলুসিনেশনের ব্যাপারগুলি একা থাকলেই হয়।

আমি দ্বিতীয় কাপ চায়ে চুমুক দিলাম। রফিক ভয়ে ভয়ে বলল, জলিল সাবরে খবর দিব?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম। জলিল সাহেব (মোঃ আবদুল জলিল) আমাদের পারিবারিক ডাক্তার। বয়সজনিত কারণে এখন রোগী দেখা বন্ধ। করেছেন, তবে আমার চিকিৎসা এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। খবর পেলেই তাঁর মরিস মাইনর গাড়ি নিয়ে ছুটে আসেন। তাঁর সমস্যা একটাই, ছোট কোনো অসুখ তিনি চিন্তা করতে পারেন না। যদি তাকে বলা হয় মাথাব্যথা। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন–ঘনঘন মাথাব্যথা? বলে কী! মাথায় কোনো টিউমার হয় নি। তো? বাবা, চোখে কি ঝাপসা দেখ? যদি বলি–ডান পাটা কেমন যেন ফোলা ফোলা লাগছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলায় বলেন–পা ফোলা তো ভালো কথা না। কিডনি ফেল করে নি তো? আজকাল ঘরে ঘরে কিডনি ফেল করা রোগী।

রফিক আবারো বলল, জলিল সাবরে খবর দেই?

আমি বললাম, খবর দিতে হবে না। আমি ভালো আছি। রফিক শোন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিয়ে করব।

রফিক চমকে উঠল। সম্ভবত কিছুক্ষণ ঠিকমতো নিঃশ্বাসও নিতে পারল না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হড়বড় করে বলল, ইফতেখার সাবরে খবর দেই?

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, দাও।

আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন আছে। তাদের দায়িত্ব ভাগ করা। চিকিৎসাসংক্রান্ত কাজের জন্যে আছেন জলিল চাচা। পারিবারিক কর্মকাণ্ডের জন্যে আছেন শেখ ইফতেখার। সম্পর্কে মামা। আমার মায়ের খালাতো ভাই। বৈষয়িক কর্মকাণ্ডের জন্যে আছেন রহমত মিয়া। অতি অতি ধুরন্ধর লোক। দিনকে রাত করা তার কাছে ছেলেখেলা। তার কর্মপদ্ধতি যথেষ্ট জটিল। তিনি যে ফিলসফিতে বিশ্বাস করেন সেটা– অনুরোধে কাজ করব না। করাব না। ধরাধরিতেও কাজ করাব না। টাকা দিয়ে কাজ করাব। হাসিমুখে কাজ করবে, সময়মতো করবে, দেখা হলে কুকুরের মতো আনন্দে লেজ নাড়বে। মানুষ যখন আনন্দে তার অদৃশ্য লেজ নাড়ায় তখন দেখতে বড় মজা লাগে।

রহমত মিয়া মাসে একবার গাড়ি নিয়ে ভৈরব চলে যান। গাড়ি ভর্তি করে। বিশাল বিশাল মাছ নিয়ে ফেরেন। সেইসব মাছ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের বাড়িতে উপহার হিসেবে চলে যায়। রহমত মিয়া মাথা নিচু করে বলেন, বুঝলেন ভাইজান, পাঁচ হাজার টাকার একটা মাছে যে কাজ করবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ঘুসে সেই কাজ হবে না। দু'শটা এক বিঘৎ সাইজের কৈ মাছ দিয়ে আমি একবার দশ লাখ টাকার কাজ করিয়ে নিয়েছিলাম।

মানুষকে ঘুস দেয়া বিরাট শিল্পকর্ম। রহমত মিয়া সেই শিল্পকর্মের একজন বিপুল কারিগর। তার কথা পরে বলব, এখন ইফতেখার মামার প্রসঙ্গে আসি। বৈষয়িক লাইনে যেমন রহমত মিয়া, পারিবারিক লাইনে তেমনি ইফতেখার মামা। বিশাল কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথায় রুমী টুপি (এই জিনিস নাটক-সিনেমা ছাড়া আজকাল দেখি না, কিন্তু মামার কাছে আছে)। ইফতেখার মামার সঙ্গে ব্রিফকেস জাতীয় একটা ব্যাগ সবসময় থাকে। ব্যাগের ভেতর থাকে একটা জায়নামাজ, তসবি, একটা কোরান শরিফ এবং এক বোতল জমজমের পানি।

কথাবার্তার এক ফাকে যখন খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে তখন তিনি অবধারিতভাবে গম্ভীর গলায় বলেন, একটু অজুর পানি দিতে হয় যে, নামাজ পড়ব। কেবলা কোন দিকে?

তিনি অনেক সময় নিয়ে নামাজ পড়েন। তসবি পাঠ করেন। চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ সময় মোনাজাত করেন। নামাজ এবং মোনাজাতপর্ব শেষ হবার পর তিনি সবাইকে এক ঢোক করে জমজমের পানি খেতে দেন। সেই পানি 'বিসমিল্লাহ' বলে কেবলামুখি হয়ে (নামাজের ভঙ্গিতে বসে) খেতে হয়।

ইফতেখার মামার বোতলের জমজমের পানি কখনো শেষ হয় না। বোতল অর্ধেক খালি হতেই তিনি তার সঙ্গে মিনারেল ওয়াটার যুক্ত করেন। তিনি বিশিষ্ট আলেমদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন এতে জমজমের পানির গুণাগুণের কোনো তারতম্য হয় না।

তিনি যখন নতুন কারো সঙ্গে কথা বলেন তখন কথাবার্তার একটা পর্যায়ে বলেন–বুঝলেন জনাব, আমি অতি ক্ষুদ্র নাদান মানুষ। গুনার মধ্যে ডুবে আছি। মৃত্যুর পরে আল্লাহ আমাকে কী আজাব দিবেন সেই চিন্তায় অস্থির থাকি। রাতে ঘুম হয় না। গেলাম একবার হজ করতে। সেখানে কাবা শরিফ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কিছু পারি না-পারি, নবিজির একটা সুন্নত বাকি জীবন পালন করব। মিথ্যা কথা বলব না। ঝোকের মাথায় প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলাম, তারপরে যে বিপদে পড়েছি সেই বিপদের কোনো মা-বাপ নাই। মনের ভুলে যদি ফুট ফাট এক আধটা মিথ্যা বলে ফেলি, সাথে সাথে যে হাতে কাবা ছুঁয়ে ছিলাম সেই হাত অবশ হয়ে যায়। তওবা না করা পর্যন্ত হাত ঠিক হয় না। আমি কী যে মুসিবতের মধ্যে আছি সেটা আর আপনাদের কী বলব, আমার মতো বিপদে যেন কেউ না পড়ে।

এই ধরনের মানুষ অতি দ্রুত যে-কোনো পরিবেশে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ইফতেখার মামা এই কাজটি করেন।

ভাই, আপনি কী বললেন? কাবা শরিফ ছুঁয়ে সত্যি সত্যি তিনি কোনো প্রতিজ্ঞা করেছেন কি-না? আমি বলতে পারি না। তাকে কখনো জিজ্ঞেস করি নি। তবে তিনি যে সত্যি কথা বলেন এটা ঠিক।

ইফতেখার মামা অতি দ্রুত আমার বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। মেয়ের নাম সাথী। সে ডাক্তার।

চমকে উঠলেন, না? আগে আপনাকে বলেছিলাম মেয়ের নাম রূপা। মেয়ে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। মেয়ের বড় বোন ডাক্তার, তার নাম সাথী। এই কারণেই শুরুতে আপনাকে আমার স্ত্রীর কী নাম সেটা বলতে চাচ্ছিলাম না। এখন ঘটনা বলব, আপনার কাছে সব পরিষ্কার হবে।

ইফতেখার মামা হলেন 'ধর তক্তা মার পেরেক' টাইপ মানুষ। বিয়ের কথা শুরু হবার এক সপ্তাহের মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেল। সেই বিয়েও বিচিত্র। আমি গিয়েছি মেয়ে দেখতে। খানিকটা প্রাচীন কায়দায় মেয়ে দেখা হচ্ছে। আমি বসে আছি তাদের বাড়ির বসার ঘরে। আমার সঙ্গে আছেন ইফতেখার মামা, ডাক্তার জলিল চাচা এবং রহমত মিয়া। ডাক্তার কন্যা জড়সড় ভঙ্গিতে ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে ঢুকল। ভীত চোখে সবার দিকে তাকিয়ে অতি দ্রুত ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।

জলিল চাচা বললেন, মাশাল্লা, মেয়ে তো অত্যন্ত রূপবতী।

ইফতেখার মামা বললেন, মেয়ে দেখার কিছু নাই। আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছি মেয়ে আমাদের পছন্দ। আজ আমরা ছেলে নিয়ে এসেছি। ভালো করে। ছেলে দেখেন। ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করার কিছু থাকে জিজ্ঞেস করেন। আড়ালে কথা বলাবলির কিছু নাই। পছন্দ না হলে মুখের উপর বলবেন, পছন্দ হয় নাই। আর পছন্দ হলেও মুখের উপর বলবেন, পছন্দ হয়েছে।

ইফতেখার মামা মেয়ের বাবার দিকে ঝুঁকে এসে তার হাত ধরলেন। মেয়ের বাবা ইতস্তত করতে লাগলেন। ইফতেখার মামা বললেন, ভাইসাহেব, বলেন–হ্যাঁ কি না। একটা কিছু না বলা পর্যন্ত আমি হাত ছাড়ব না।

সোবাহান সাহেব (সাথীর বাবার নাম) আমতা আমতা করে বললেন, ছেলের চেহারা ছবি তো খুবই সুন্দর। আমার পছন্দটা তো বড় না, আমার মেয়ে...

ইফতেখার মামা বললেন, যান, মেয়ের মতামত নিয়ে আসুন। বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার মতটাই গুরুত্বপূর্ণ।

চট করে সে কি কিছু বলবে? মিনিমাম সপ্তাহখানেক সময় তো দরকার।

ইফতেখার মামা বললেন, ভুল কথা বলেছেন ভাইসাহেব। এইসব কাজে সময় দিতে নাই। সময় দিলেই নানান হুজ্জত শুরু হয়। লাগানি ভাঙ্গানি চলতে থাকে। আপনি ভেতরে যান। মেয়ের মতামত নিয়ে আসেন।

সোবাহান সাহেব ভেতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, মেয়ে। কিছু বলছে না। চুপ করে আছে।

ইফতেখার মামা বললেন, কান্নাকাটি কি করছে?

জি-না।

ইফতেখার মামা বললেন, তাহলে মেয়ের মত আছে। বাঙালি মেয়েকে। কখনো শুনছেন যে মুখ ফুটে বলবে বিয়েতে রাজি? রাজি না হলে বলবে–রাজি না। চোখের পানি ফেলবে। মেয়ে কাঁদছে না, কিছু বলছেও না–তার মানে আলহামদুলিল্লাহ। আসুন বিয়ে পড়িয়ে দেই।

সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, বিয়ে পড়িয়ে দেবেন মানে কী?

ইফতেখার মামা হাসিমুখে বললেন, আপনাকে বলা হয় নাই, আমি একজন সরকারি কাজি। আমার কালো ব্যাগটার ভেতর কোরান শরিফ জায়নামাজ যেমন। আছে, কাবিননামার কাগজপত্রও আছে। সবসময় সঙ্গে রাখি। কখন কোন কাজে লাগে কে জানে। যান মেয়েকে অজু করতে বলেন। এজিন কাবিন হয়ে থাকুক। মেয়েকে তুলে নেয়া হবে পরে। তখন আমরা উৎসব করব।

সোবাহান সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, এইসব আপনি কী বলছেন?

ইফতেখার মামা মধুর হাসি হেসে বললেন, আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র। অতি শুভ সময়। আল্লাহপাকের যদি হুকুম থাকে তাহলে আজই বিয়ে হবে। হুকুম না থাকলে কোনোদিন হবে না। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, রিজিক, ধনদৌলত–এই পাঁচ জিনিস আল্লাহপাক নিজের হাতে রেখেছেন। দেখি তাঁর মনে কী আছে।

সত্যি সত্যি সেই রাতেই বিয়ে হয়ে গেল। ইফতেখার মামা তার কালো ব্যাগ খুলে সবাইকে খোরমা খাওয়ালেন। খোরমা দেখে বুঝলাম তিনি মোটামুটি তৈরি হয়েই এসেছেন।

নাটক-নভেলে যেমন ঘটনা থাকে সে-রকম একটা ঘটনা ঘটল আমার বিয়ের রাতেই। আমি বাসায় চলে এসেছি। রাতে শোবার আয়োজন করেছি, এমন সময় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে টেলিফোন। টেলিফোন করেছে আমার মেজ শালি। তার নাম রূপা। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমাদের বাড়িতে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে।

আমি বললাম, কী ঘটনা ঘটেছে?

বড় আপা খুব কান্নাকাটি করছে।

আমি বললাম, বিয়ের পর মেয়েরা কান্নাকাটি করেই থাকে।

রূপা বলল, আপনি বুঝতে পারছেন না। বড় আপা শুধু যে কান্নাকাটি করছে তা-না, সে ঘনঘন ফিটও হচ্ছে।

আমি বললাম, ফিট হচ্ছে কেন? তার কি মৃগীরোগ আছে?

রূপা বলল, মৃগীরোগ নেই। আপা হুট করে পড়ানো বিয়ে মানতে পারছে। সে বলছে এই বিয়ে যদি না ভাঙা হয় তাহলে সে হয় ছাদ থেকে লাফ দিয়ে। নিচে পড়বে আর না হয় ঘুমের ওষুধ খাবে।

তুমি তোমার আপাকে দাও, আমি কথা বলি।

আচ্ছা আপনি ধরুন, আমি আপাকে দিচ্ছি।

আমি প্রায় পনেরো মিনিট টেলিফোন কানে ধরে বসে রইলাম। পনেরো মিনিট পর রূপা এসে বলল, আপা আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি না। সে দেয়ালে মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে। গলগল করে রক্ত পড়ছে।

বলো কী?

আমি আপনার পায়ে পড়ছি-আপনি বিয়ে ভাঙার একটা ব্যবস্থা করুন। আপা খুবই ইমোশনাল একটা মেয়ে। বিয়ে না ভাঙলে আপাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

আমি শান্ত গলায় বললাম, তুমি তোমার আপাকে বলো–আগামীকাল সকাল দশটার দিকে আমি ইফতেখার মামাকে নিয়ে আসব, বিয়ে ভাঙাতে হলে যা যা করণীয় তখন তা করা

হবে। আমি রাতেই আসতাম, কিন্তু এত রাতে মামাকে পাওয়া যাবে না। মামা রাত বারটার পর থেকে তাহাজ্জুতের নামাজে দাঁড়ান। তখন তাঁকে ডাকা নিষেধ।

আপনি কি সত্যি সত্যি কাল সকালে আসবেন?

অবশ্যই আসব। দশটার মধ্যেই আসব।

থ্যাংক য়্যু।

থ্যাংকস দিতে হবে না। তুমি তোমার আপাকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে যেতে বলো।

পরদিন তালাকের ব্যবস্থা হলো। আমি তালাকপর্বের পর হাসিমুখেই কিছুক্ষণ ঐ বাড়িতে থাকলাম। চানাচুর এবং ঘরে বানানো পায়েস খেলাম। সোবাহান সাহেবের সঙ্গে দেশের রাজনীতি নিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। তিনি তার গ্রামের বাড়িতে তার দাদার হাতে লাগানো একটা পেয়ারা গাছের গল্প করলেন। সেই পেয়ারা নাকি এই ভুবনের সেরা। একবার যে ঐ পেয়ারা খেয়েছে। সে বাকি জীবনে আর পেয়ারা মুখে দিতে পারবে না। পেয়ারা মুখে দিলেই থু করে ফেলে দেবে। আমি পেয়ারার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখালাম। তিনি বললেন, ওই পেয়ারা এনে তিনি আমাকে খাওয়াবেন।

আষাঢ় মাসে তিনি সত্যি সত্যি পেয়ারা এনে আমাকে খাওয়ালেন এবং শ্রাবণ মাসে তার মেজ মেয়ে রূপার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। তাড়াহুড়া বিয়ে না। আয়োজনের বিয়ে। গায়ে-হলুদ ফলুদ সবই হলো। বরের জুতা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া থেকে আয়নায় বর-কনের মুখ

দেখাদেখি কিছুই বাদ গেল না। রূপার বড় বোন খুবই আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি অনুষ্ঠানে যোগ দিল।

৩. বাসররাতে স্ত্রীকে কী কী কথা বলবে

আমার ধারণা বাসররাতে স্ত্রীকে কী কী কথা বলবে সব ছেলেই তা ঠিক করে রাখে। কয়েকবার রিহার্সেলও দেয়। মূল সময়ে সব গুবলেট করে ফেলে। আমার বন্ধু ফরহাদ বাসররাতে স্ত্রীকে শুনিয়ে মুগ্ধ করার জন্যে একটি দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে রেখেছিল। তার স্ত্রীর নাম ঝরনা। সে মুখস্থ করেছিল সত্যেন্দ্রনাথের ঝর্ণা কবিতাটি। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, ঐ যে—

ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা
অঞ্চল সিঞ্চিত গৌরিক স্বর্ণে
গিরিমল্লিকা দুলে কুন্তল কর্ণে।

ঝাড়া মুখস্থ করা এই কবিতা বেচারা ফরহাদ বাসররাতের উত্তেজনায় পুরোপুরি ভুলে গেল। সে পুরো রাত কাটিয়ে দিল কবিতাটা মনে করার চেষ্টা করতে করতে। শীতের রাতেও তার কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তার স্ত্রী লজ্জা ভুলে গিয়ে কয়েকবার জিজ্ঞেস করল, আপনার কি শরীর খারাপ?

আমি আর দশজন মানুষের মতো না। আমি যা ঠিক করি তা করি। বাসররাতে রূপাকে কী বলব সব আমি গুছিয়ে রাখলাম। তার রূপা নামটা পাল্টে দিতে হবে। রূপ থেকে রূপা। এই নাম চিৎকার করে বলে–আমি রূপবতী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক উপন্যাসের নায়কের নাম যেমন ছিল 'রাজকুমার'। নামটাই বলে দিচ্ছে মানুষটা অসম্ভব রূপবান। আপনি কি উপন্যাসটা পড়েছেন? উপন্যাসের নাম 'চতুষ্কোণ'। এই একটি মাত্র উপন্যাস পড়েই কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমার রাজকুমার হতে ইচ্ছা করেছিল। আপনি উপন্যাসটা না পড়ে থাকলে আপনাকে দিতে পারি। আপনি পুরোপুরি নিয়ে যেতে পারেন। আমার কাছে দু'টা কপি আছে। প্রথমটা হারিয়ে গেছে ভেবে আরেকটা কিনেছিলাম। কেনার পর পরই হারানো কপি ফিরে পেয়েছি। একই বইয়ের দু'টা কপি ঘরে রাখার কোনো মানে হয় না।

মূল গল্পে ফিরে যাই। রূপাকে কী বলব সব গুছিয়ে ফেললাম। প্রথমে নাম বদল, তারপর...

আমার বন্ধু ফরহাদের যেমন সব আউলে গিয়েছিল আমারও সে-রকম হলো। আমার আউলে গেল ভিন্ন কারণে। আমি দেখলাম রূপা কেমন করে যেন তাকাচ্ছে আমার দিকে। টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর শাঁ শাঁ শব্দ করছে। আমি বললাম, শব্দ কিসের?

সে বলল, আমার এলার্জির সমস্যা আছে।

আমি বললাম, এলার্জির সমস্যা থাকলে শাঁ শাঁ শব্দ হয়?

সে বলল, এলার্জির অ্যাটাক হলে শ্বাসনালি ফুলে যায়, তখন নিঃশ্বাসে কষ্ট হয় আর শাঁ শাঁ শব্দ হয়।

নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ।

এর চিকিৎসা নেই?

ইনহেলার নিলে কমবে। আমি ইনহেলার আনতে ভুলে গেছি।

আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

রহমত মিয়াকে ইনহেলার আনতে পাঠিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি রূপা স্বাভাবিক হয়েছে। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আমি বললাম, ঘটনা কী? সেরে গেছে?

হুঁ।

আবার হবে?

জানি না।

গরম চা কিংবা কফি খাবে?

না।

আমি খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, তোমার রূপা। নামটা আমি বদলে দেব। এই নাম আমার পছন্দ না। নতুন নাম দেব।

কী নাম?

এখন থেকে তোমার নাম দস্তা।

কী নাম?

দস্তা। Zinc.

রূপা অবাক হয়ে বলল, দস্তা নাম কেন?

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, দস্তা আমার পছন্দের নাম। তাছাড়া একজন বিখ্যাত কবি তাঁর প্রেমিকাকে দস্তা-কন্যা সম্বোধন করেছেন।

দস্তা-কন্যা?

হ্যাঁ। আমেরিকান কবি। কবির নাম রবার্ট ফ্রস্ট। রবার্ট ফ্রস্টের নাম নিশ্চয়ই জানো। তুমি সাহিত্যের ছাত্রী।

রবার্ট ফ্রস্টের নাম জানি। কিন্তু তিনি তাঁর প্রেমিকাকে দস্তা-কন্যা ডাকতেন তা জানতাম না।

তিনি ডেকেছেন Zinc Lady নামে। আমি বঙ্গানুবাদ করলাম।

কবিতাটা কি আপনার মনে আছে? হ্যাঁ আছে। পুরোটা মনে নেই, কয়েক লাইন আছে—

Out of grave I come to tell you this,
Out of grave I come to quench the kiss
Oh my Zinc Lady.

দস্তা-কন্যা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। শা শাঁ শব্দ আবারো শোনা যাচ্ছে। আমি বললাম, পানি খাবে?

দস্তা-কন্যা ক্ষীণ স্বরে বলল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, তুমি তো বাড়াবাড়ি রকমের অসুস্থ।

সে বলল, আমি সবসময় এরকম থাকি না। মাঝে মাঝে শরীর বেশি খারাপ করে।

তখন কী কর? শুয়ে থাক?

না, আধশোয়া হয়ে থাকি। আধশোয়া হয়ে থাকলে কষ্ট কম হয়।

তাহলে থাক আধশোয়া হয়ে।

দস্তা-কন্যা বাকি রাতটা খাটে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে কাটিয়ে দিল। আমি এক ঘুম দিয়ে জেগে উঠে দেখি সে ঠিক আগের জায়গায় বসে আছে। শা শাঁ শব্দ হচ্ছে। তার চোখ চকচক করছে। মনে হয় একটু আগে কেঁদেছিল। এখন কান্না নেই কিন্তু কান্নার ছায়া চোখে লেগে আছে। দস্তা-কন্যার এই হতাশ ক্লান্ত রূপ দেখেই হয়তো আমি সেই রাতে তার প্রেমে পড়েছিলাম।

ভাই, আমি আমার প্রেমের গল্পটাই আসলে আপনাকে বলছি।

সবার প্রেম কি এক রকম হয়? একেকজনের প্রেম হয় একেক রকম। কেউ প্রেমে পড়লে প্রেমিকাকে নিয়ে পার্কে চলে যায়। এক ঠোঙা বাদাম কিনে। বাদাম ভেঙে ভেঙে প্রেমিকার হাতে তুলে দিয়ে গদগদ গলায় বলে, আজকে তোমাকে কী যে সুন্দর লাগছে!

আবার আরেক দল আছে...

আচ্ছা থাকুক, আমি প্রেম-শাস্ত্রের গবেষক না। আমি আমার নিজের প্রেমের গল্পটাই গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি। তার আগে আমার অতি প্রিয় প্রেমের কবিতার কয়েকটা লাইন শুনবেন?

Love strong as death is dead
Come let us make his bed
Among the dying flowers;
A green turf at his head;
And a stone at his feet,
Whereon we may sit

In the quiet evening hours.

আজ থেকে দেড় শ’ বছর আগে ক্রিস্টিনা রোসেটি নামের এক তরুণী এই কবিতাটি লিখেছেন। আমি তার বঙ্গানুবাদ করেছি। ও আচ্ছা, আপনাকে বলা হয়। নি, আমার কবিতা-রোগ আছে। চার ছ’লাইনের কবিতা (কিংবা পদ্য) মাঝেমধ্যে লিখি। গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করে বানরগুলোকে শোনাই। এরা কবিতা পাঠের সময় ঝিম ধরে থাকে এবং অতি দ্রুত চোখ পিটপিট করতে থাকে। মজার ব্যাপার না?

যাই হোক, ক্রিস্টিনা রোসেটির কবিতার অনুবাদ কেমন হয়েছে দেখুন তো–

মৃত্যুর মতো প্রগাঢ় প্রেম কিন্তু মৃত
এসো সেই শবদেহের জন্যে একটা বিছানা করি।
ছড়িয়ে দেই কিছু শুকনো ফুল,
একটা সবুজ চাদর থাকুক তার মাথার পাশে
আর পায়ের কাছে একটা প্রস্তরখণ্ড।
আমরা দু’জন বসব সেই পাথরে।
কাটিয়ে দেব অলস বিকেলের শান্ত সময়।

ভাই, কী বললেন, আবার বলুন, আমি বুঝতে পারি নি। ও আচ্ছা আচ্ছা যে সমস্যা সমাধানের জন্যে বিয়ে করেছি সেই সমস্যার সমাধান হয়েছিল কি না। বিয়ের পরেও নারীকণ্ঠ শোনা যেত কি যেত না। তাই তো?

না, সমস্যার সমাধান হয় নি। হঠাৎ হঠাৎ নারীকণ্ঠ শুনতাম। বিয়ের পর প্রথম যেদিন নারীকণ্ঠ শুনলাম সেদিনের কথা বলি। দস্তা-কন্যা ঢুকেছে। বাথরুমে। শাওয়ার ছেড়ে এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় নিয়ে সে গোসল করবে। আমি বসে আছি বারান্দায় বানরগুলির জন্যে অপেক্ষা করছি। কিংবা অপেক্ষা ছাড়াই বসে আছি। হাতে বই আছে। ইচ্ছা হলে দু'এক পাতা পড়ব, ইচ্ছা না হলে পড়ব না। সময় কাটছে আরামদায়ক আলস্যে। ক্রিস্টিনা রোসেটির কবিতার মতো—'কাটিয়ে দেব অলস বিকেলের শান্ত সময়'।

তখন খুব কাছ থেকে কে যেন বলল, কী করছেন? আমি এতই চমকালাম যে হাত থেকে বই পড়ে গেল। ভয়ঙ্করভাবে চমকানোর প্রধান কারণ হলো–নারীকণ্ঠটা এখন চেনা। দস্তা-কন্যার গলা এবং এতে কোনো ভুল নেই। দস্তাকন্যা বাসররাতে আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বললেও এখন 'তুমি' করে বলে। নারীকণ্ঠ বলছে 'আপনি' করে। প্রভেদ বলতে এইটুকুই।

আমি সারা বিকাল ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে সন্ধ্যা নাগাদ একটা মোটামুটি সমাধান দাঁড় করিয়ে ফেললাম। আমি আমার সমাধানটা আপনাকে বলছি। এই বিষয়ে আপনার কোনো মতামত থাকলে সেটা পরে শুনব।

আমার ব্যাখ্যা হলো মানুষের মস্তিষ্ক অপরিচিত কোনো জিনিস বেশিক্ষণ সহ্য করে না। নানানভাবে সে চেষ্টা করে অপরিচিত জিনিসটাকে পরিচিত করতে। একটা লম্বা দাগের দু'পাশে দু'টা ফুটা আঁকলে মস্তিষ্ক সেটাকে মানুষের আদল দিতে চেষ্টা করে। আমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটছে। তরুণী-কণ্ঠকে সে পরিচিত করার ব্যবস্থা করছে।

তরুণী-কণ্ঠ দ্বিতীয়বার শুনলাম এক মধ্যরাতে। হঠাৎ পানির পিপাসায় ঘুম ভেঙে গেছে। দস্তা-কন্যা হাত-পা গুটিয়ে ছোট বাচ্চাদের মতো ঘুমাচ্ছে। আমি খুব সাবধানে তার ঘুম না ভাঙিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। পাশের ঘরে গেলাম। ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করে পর পর দু'গ্লাস বরফ-শীতল পানি খেলাম। হঠাৎ করে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার জন্যেই হয়তো ঘুম পুরোপুরি কেটে গেল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাবার পর যদি ঘুম না আসে, তাহলে বেশিরভাগ মানুষই খুব আপসেট হয়ে পড়ে। আমার কিন্তু ভালোই লাগে। নীরব সুনসান রাতে চুপচাপ বসে থাকার মধ্যেও আনন্দ। দিনের বেলায় হৈচৈ কোলাহলে জেগে থাকার চেয়ে রাতের জেগে থাকা শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্যে আনন্দময়। মানুষের কান পঁয়ত্রিশ ডেসিবেলের চেয়ে উঁচু শব্দ শুনলে কষ্ট পায়। রাতের বেলায় শব্দমাত্রা নিশ্চয়ই পঁয়ত্রিশ ডেসিবেলের নিচে।

আমি লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলাম। শেলফের কাছে গিয়ে চোখ বন্ধ করে হাত বাড়ালাম। যে বইটা হাত দিয়ে প্রথম ছোঁব সেটাই পড়ব। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে যে পড়া ধরব তা না। ইজিচেয়ারে শুয়ে বই খুলব (চোখ তখনো বন্ধ)। যে পৃষ্ঠাটা খোলা হবে সেখান থেকেই পড়া শুরু করব। এটা আমার একটা খেলা। শিশুরা যেমন বড়দের মতো কিছু খেলার চেষ্টা করে, বড়রাও সে-রকম শিশুদের কিছু খেলা খেলে।

বই পড়তে শুরু করেছি। হাতে এসেছে মার্কেজের লেখা 'দ্য স্টোরি অফ এ শিপরেকড সেইলার'-এর ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন- রেনডলফ হোগান। বই পড়তে যাব, তখন নারীকণ্ঠ শুনলাম–ঘুমাচ্ছেন না কেন?

সূচিপত্র

আমি অন্যদিনের মতো এদিক ওদিক তাকালাম না। চোখ বন্ধ করে বললাম, ঘুম আসছে না, তাই ঘুমাচ্ছি না। বলেই অপেক্ষা করতে লাগলাম কী জবাব আসে তা শোনার জন্যে। কোনো জবাব এলো না। আমি যখন মোটামুটি নিশ্চিত যে জবাব আসবে না, তখন পায়ের শব্দ শুনলাম। কেউ যেন এগিয়ে আসছে। এই তো লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল। এগুচ্ছে আমার দিকে। এই তো আমার ইজিচেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখার। অনেক কষ্টে সেই ইচ্ছা দমন করলাম। যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখি সে কথা বলে কি-না।

সে কথা বলল। অবিকল দস্তা-কন্যার গলায় কিছুটা আদুরে ভঙ্গিতে বলল, কী পড়ছেন?

বই।

কী বই?

দ্য স্টোরি অফ এ শিপরেকড সেইলার।

শব্দ করে পড়ুন না। আমিও শুনি।

তুমি কে?

নারীকণ্ঠ জবাব দিল না। খিলখিল করে হাসল। সে সম্ভবত হাত নাড়িয়েছে। কারণ তার হাতে চুড়ির শব্দ শুনলাম। কাচের চুড়ি। এটা একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য। দস্তা-কন্যা কাচের চুড়ি, সোনার চুড়ি–কোনো চুড়িই পরে না। চুড়ির টুং টাং শব্দ তার ভালো লাগে না।

তোমার নাম কী?

(আবারো হাসি)

হাসছ কেন?

নাম জিজ্ঞেস করছি, নাম বলো।

আমার নাম কাঁসা।

কাঁসা মানে?

কাঁসা চেনেন না? তামা এবং দস্তা মিলিয়ে হয় কাঁসা। (আবারো হাসি)

আমি যদি এখন পেছন দিকে ফিরি, তাহলে কি তোমাকে দেখতে পাব?

দেখতে পেতেও পারেন, আবার নাও পেতে পারেন। (হাসি)

আমি সাবধানে চোখ খুললাম। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম। পেছনে কেউ নেই। শুধু দরজার পর্দা কাঁপছে। বলাই বাহুল্য, বাতাসে কাঁপছে। তবে কেউ যদি ভাবতে চায় কাঁসা নামের মেয়েটি কিছুক্ষণ আগে পর্দা সরিয়ে এই দরজা দিয়ে চলে গেছে–তাও ভাবতে পারে।

কোলের উপর রাখা বই পড়ছি। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি মেয়েটি আবারো আসবে। সে এলো না। আমি বইটা ইজিচেয়ারে রেখে ঘুমুতে গেলাম। যদি ঘুম আসে–আবারো বই পড়তে আসব।

দস্তা-কন্যা ঠিক আগের ভঙ্গিতেই ঘুমুচ্ছে। ভালো করে লক্ষ করে দেখি, তার হাতভর্তি কাচের চুড়ি। যে চুড়ি পছন্দ করে না সে হঠাৎ করে হাতভর্তি চুড়ি কেন পরল? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। বাতি নিভিয়ে আমি কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। চেষ্টা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ব।

একটু আগে যে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছি সে আর কেউ না–সে আমার মস্তিষ্কের কল্পনা। আমি নিজে আমার নিজের সঙ্গে কথা বলেছি। মেয়েটির হাতভর্তি চুড়ি দেখেছি–এরও একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে। দস্তা-কন্যা আজ চুড়ি পরেছে। আমার চোখে তা পড়েছে। অস্পষ্টভাবে পড়েছে। চুড়ির টুংটাং শব্দ কানে এসেছে। মস্তিষ্ক টুং টাং শব্দের অংশটা স্মৃতিকোষে জমা করে রেখেছে। সে এই শব্দ নিয়েই খেলা করেছে।

মানুষের মস্তিষ্ক মাঝে মাঝে কিছু অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে, বিভিন্ন স্মৃতিকোষে জমা করে রাখা স্মৃতি নিয়ে নিজের ইচ্ছামতো ঘটনা সাজায় এবং স্মৃতির ফাক ভর্তি করে। একে বলে কনফ্যাবুলেশন, বাংলায় 'মিথ্যা-স্মরণ'। সাইকোসিসের রোগের শুরুটা হয় এইভাবে। এক পর্যায়ে সে বাস্তবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক হারিয়ে মনগড়া জগতে বাস করতে থাকে।

আমার বেলাতেও হয়তো এরকম কিছু ঘটবে। আমি দস্তা-কন্যা এবং কাঁসাকন্যা দুজনের সঙ্গে জীবনযাপন করতে থাকব। দু'জনের ভেতর থেকে একজনকে বেছে নেব। সেই একজন দস্তা-কন্যা হতে পারে, আবার কাসাকন্যাও হতে পারে।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ঘুম আসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুধু শুধু বিছানায় গড়াগড়ির কোনো মানে হয় না। বরং বইটা পড়া যেতে পারে। বই পড়ার সময় কাঁসা-কন্যা যদি উপস্থিত হয় তাহলেও মন্দ হয় না।

লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে আমাকে ধাক্কার মতো খেতে হলো। ইজিচেয়ারে রাখা বইটা নেই। বইটা শেলফে সাজিয়ে রাখা।

কাজটা কে করেছে? দোতলায় কেউ আসে না। এই নিয়ম অনেক দিনের। কাজের মানুষরা কেউ এ নিয়ম ভাঙবে না। তাহলে ইজিচেয়ার থেকে বইটা নিয়ে শেলফে কে রাখল? কাঁসা-কন্যা? না-কি এই কাজটা আমি নিজেই করেছি! তারপর ভুলে গেছি। এই স্মৃতি মস্তিষ্কে নেই।

মস্তিষ্ক কিছু কিছু স্মৃতি মুছে ফেলছে। সে এই কাজ যখন করা শুরু করবে তখন থেমে থাকবে না। স্মৃতি মুছবে, স্মৃতি এলোমেলো করে সাজাবে।

আমি ইজিচেয়ারে বসলাম। এবার আমার হাতে বই নেই। চুপচাপ বসে থাকার জন্যেই বসে থাকা। আমার শীত শীত লাগছে। শীত লাগার কি কথা? না-কি শারীরিক অনুভূতির ব্যাপারেও সমস্যা দেখা দিয়েছে?

তুমি এখানে কী করছ?

কাঁসা-কন্যার গলা। সে ঠিক আগের মতো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম না। যেভাবে বসেছিলাম সেভাবেই বসে রইলাম। আমার দৃষ্টি শেলফে রাখা বইটার দিকে।

কাঁসা-কন্যা আবারো বলল, তুমি কী করছ?

বই পড়ছি।

তোমার হাতে তো বই নেই। বই পড়ছ কীভাবে?

ও আচ্ছা তাই তো! বই পড়ব বলে ভাবছি। তুমি কি নীল রঙের ঐ বইটা এনে দেবে? শেলফ থেকে একটু বের হয়ে এসেছে।

কাঁসা-কন্যা ইজিচেয়ারের পেছন থেকে সামনে চলে এলো। আমি দেখলাম কাঁসা-কন্যা না। যে আমার সামনে এসেছে সে রূপা, আমাদের দস্তা।

সে বই এনে আমার হাতে দিতে দিতে বলল, ঘুম ভাঙার পর খুব ভয় পেয়েছি।

কেন?

তুমি পাশে নেই, আমি ভয় পাব না? তোমাদের এই বিশাল বাড়ি। সারাক্ষণই এদিকে ওদিকে ভৌতিক শব্দ হয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তুমি কি রাতদুপুরে সত্যি সত্যি বই পড়বে?

পড়ব।

তাহলে আমি তোমার পাশে বসে থাকি। আমি একা শুয়ে থাকতে পারব না।

দস্তা শোন, তোমার একা শুয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। আমি প্রায়ই ছাদে চলে যাই। ছাদে পাটি পেতে শুয়ে থাকি।

কেন?

আমার কিছু বিচিত্র অভ্যাস আছে। বিচিত্র অভ্যাসের একটি হলো, ছাদে পাটি বিছিয়ে শুয়ে থেকে আকাশের তারা দেখা।

তুমি যখন ছাদে যাবে অবশ্যই ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে। আমিও ছাদে তোমার সঙ্গে শুয়ে থাকব। তারা দেখব।

আমি চুপ করে থাকলাম। দস্তা আগ্রহের সঙ্গে বলল, এখন ছাদে যাবে? চল যাই।

আমি বললাম, এখন যেতে ইচ্ছা করছে না।

দস্তা বলল, ইচ্ছা না করলে যেতে হবে না। এখন কি তোমার বই পড়তে ইচ্ছা করছে?

আমি বললাম, আমার ঠিক কী ইচ্ছা করছে বুঝতে পারছি না।

দস্তা বলল, আমার কী ইচ্ছা করছে বলব?

বলো।

আমার ইচ্ছা করছে তোমার সঙ্গে গল্প করতে। তোমার যেমন রাতে ঘুম ভেঙে গেলে একা একা ছাদে চলে যাবার অভ্যাস, আমারও সে-রকম গল্প করার অভ্যাস।

কার সঙ্গে গল্প করতে?

সাথী আপার সঙ্গে। আমরা তিনবোন বড় একটা খাটে এক সঙ্গে ঘুমোতাম। আমি মেজ বলে আমি মাঝখানে, বাকি দুজন দু'পাশে। গরমের সময় মাঝখানে শুলে চাপাচাপি হয়। এই জন্যে পরে ঠিক করা হলো–ঘুমুতে যাবার আগে লটারি করা হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে সে শুবে মাঝখানে। আমার এমনই কপাল যে লটারিতে সবসময় আমার নাম উঠত। আচ্ছা আমি যে বকবক করছি তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো?

না।

এখন বিরক্ত না হলেও পরে হবে। আমি যে কী পরিমাণ কথা বলতে পারি তুমি জানো না। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে আমার নাম ছিল—'কথা সাগর'। সেকেন্ড ইয়ারে নাম হয়ে গেল—'কথা মহাসাগর'।

আমি তাকিয়ে আছি দস্তা-কন্যার দিকে। সে ইজিচেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। তার হাত ইজিচেয়ারের হাতলে। চোখ বড় বড় করে গল্প করছে–দেখতে ভালো লাগছে।

দস্তা-কন্যা বলল, কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে এসেছি। আসল কথাটা বলা হয় নি।

আসল কথা কোনটা?

ঐ যে তোমার যেমন ঘুম ভাঙলে ছাদে চলে যাওয়ার অভ্যাস আর আমার হলো ঘুম ভাঙলে কথা বলার অভ্যাস। সাথী আপার ঘুম খুব পাতলা তো–আমার ঘুম ভেঙে গেলে আমি বিছানায় উঠে বসতাম। সঙ্গে সঙ্গে সাথী আপা উঠে বসে বলত, তোর কী হয়েছে? শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না তো? আমি বলতাম, না। আপা এসো গল্প করি। তখন গল্প শুরু করতাম। এক সময় ছোটনকে ডেকে তুলতাম। ছোটন কে বুঝতে পারছ তো? আমার ছোট বোন। তখন শুরু হতো তিনজনের ম্যারাথন গল্প। আচ্ছা তুমি কি সাথী আপার উপর রাগ করে আছ?

রাগ করে থাকব কেন?

ঐ যে তোমাকে বিয়ে করে সরে গেল।

রাগ করি নি।

সাথী আপার ধারণা তুমি খুব রাগ করে আছ। এই জন্যেই সে এ বাড়িতে আসে না। যেহেতু সে আসে না, ছোটনও আসে না। আমাদের তিনবোনের এক সঙ্গে হওয়া হয় না। তুমি কি একটা মজার কথা শুনবে?

শুনব।

কথাটা তোমাকে বলা ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছি না। তুমি অন্য কিছু ভাবতে পার। আচ্ছা থাক বলেই ফেলি–আমরা তিনবোন মিলে ঠিক করেছিলাম তিনজন একটা ছেলেকে বিয়ে করব। যাতে সারা জীবন আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি। অদ্ভুত ব্যাপার কী দেখেছ, আমার বড়বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, তারপর হলো আমার সঙ্গে। এক সময় হয়তো দেখা যাবে ছোটনের সঙ্গেও তোমার বিয়ে হয়েছে। তুমি আমার কথা শুনে রাগ করছ না তো?

না।

সত্যি রাগ করছ না?

না।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি রাগ করেছ। কারণ তোমার ভুরু কুঁচকে আছে।

আমি রাগ করি নি। বরং খানিকটা মজা পেয়েছি।

তাহলে ভুরু কুঁচকে আছ কেন? মজা পেলে কেউ ভুরু কুঁচকে থাকে না।

ভুরু কুঁচকে আছি কারণ আমি একটা বইয়ের নাম মনে করার চেষ্টা করছি। বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস। সেখানে তিনবোন একটা ছেলেকে বিয়ে করে।

দস্তা-কন্যা হাসিমুখে বলল, বইটার নাম 'ইছামতি। তোমার কি তিন বোনের নাম মনে আছে? ওদের নাম তিলু, বিলু, নীলু। এখন দয়া করে তোমার ভুরু ঠিক কর। ভুরু কুঁচকে আছে এমন মানুষ দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে। কারণ কী জানো? কারণ আমার বাবা সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে থাকেন। তাকে দেখে। মনে হয় তিনি শুধু যে জগৎ-সংসারের উপর বিরক্ত তা না, তিনি পুরো সৌরমণ্ডলের উপর বিরক্ত। এই, চা খাবে?

না।

খাও না একটু চা। আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে। আমরা তিনবোন যখন গল্প করে রাত কাটাতাম তখন ঘনঘন চা খেতাম। চা বানাব?

বানাও।

তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি চা বানাব, তুমি পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমি বোধহয় জানো না আমার সারাক্ষণ তোমার পাশে থাকতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ তোমাকে না দেখলে আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ?

হ্যাঁ।

না, তুমি বিশ্বাস করছ না। তুমি অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে আছ।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, দস্তা-কন্যার চোখ পানিতে ভরে গেছে। শুধু তাই না– ইজিচেয়ারের হাতলে কয়েক ফোঁটা চোখের পানি পড়ল। আমি আবার ভুরু কুঁচকে ফেললাম। চোখের পানি নিয়ে টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা আছে। কবিতাটা মনে করার চেষ্টা করছি–

Come not, when I am dead,
To drop thy foolish tears upon my grave.

আমার মৃত্যুর পর তুমি এসো না,
তোমার নির্বোধ অশ্রু আমার কবরে যেন না পড়ে।

৪. স্বামীর সংসার হাতে নেয়ার প্রবল বাসনা

বিয়ের পর মেয়েদের ভেতরে স্বামীর সংসার হাতে নেয়ার প্রবল বাসনা দেখা যায়। মহানন্দে তারা সংসারের দায়িত্ব নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। কী বাজার হবে, কী রান্না হবে তা নিয়ে মহা ব্যস্ততা। জানালায় নতুন পর্দা লাগানো। টিভিটা সরিয়ে নতুন জায়গায় রাখা। কাজের লোক দিয়ে বাথরুমের কমোড ঘষাঘষি করানো। সব কিছুতেই উৎসাহ।

দস্তা-কন্যার ভেতর সে-রকম কিছুই দেখা গেল না। সে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করছে আমার পেছনে। আমি বারান্দায় গেলে সেও বারান্দায়। আমি ছাদে গেলে সেও ছাদে।

আমি বিকেল থেকে আমাদের বাড়ির পেছনের লেবুবাগানে কাজ করছি, সেও মোড়া পেতে আমার পাশে বসে আছে। লেবুবাগানে কাজ করার বিষয়টা আপনাকে বলি। আমি একটা অ্যাক্সপেরিমেন্টাল লেবুবাগান করেছি। সেখানে বারটা কাগজি লেবুর গাছ আছে। গাছগুলির তিনটা গ্রুপ করেছি। প্রতিটি গ্রুপে চারটা করে গাছ। একটা গ্রুপকে স্বাভাবিকভাবে বড় হতে দেয়া হচ্ছে। আরেকটা গ্রুপে কোনো পাতা গজাতে দেয়া হচ্ছে না। পাতা হওয়া মাত্র ছিড়ে ফেলা হচ্ছে। এই গ্রুপের চারটা গাছই পুরোপুরি পত্রশূন্য। আরেকটা গ্রুপে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে। গরম বাতাস দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন বিকেলে এদেরকে দু'ঘণ্টা গরম বাতাস খাওয়ানো হয়। তিনটা গাছেই ফুল ফুটেছে। আমি দেখতে চাচ্ছি কোন গাছের লেবু কেমন হয়।

দস্তা-কন্যা খুব আগ্রহ নিয়ে আমার কর্মকাণ্ড দেখছে। এক সময় সে বলল, এগুলি কেন করছ?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, সময় কাটানোর জন্যে করছি।

তোমার কি সময় কাটে না?

কাটে, তবে ভালোভাবে কাটে না।

তোমার কি কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করে না?

না।

আত্মীয়স্বজনের বাসায় যেতে ইচ্ছা করে না?

মা। তাছাড়া আমার তেমন আত্মীয়স্বজন নেই। আমাদের পরিবারের নিয়ম হচ্ছে, এই পরিবারের লোকজন বেশিদিন বাঁচে না। সামান্য অসুখেই এদের খেল। খতম হয়ে যায়। সর্দি জ্বর, ডায়েরিয়ার মতো নির্দোষ রোগে আমার দু'বোন মারা গেছে।

বলো কী?

অসুখ-বিসুখে যারা মারা যায় না তারা তাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে।

তার মানে?

কেউ ঘুমের ওষুধ খায়, কেউ চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে বড় রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

তুমি ঠাট্টা করছ। তুমি অবশ্যই ঠাট্টা করছ।

আমি ঠাট্টা করছি এরকম মনে হচ্ছে কেন?

তুমি হাসতে হাসতে কথা বলছ। হাসতে হাসতে কেউ এমন ভয়ঙ্কর কথা বলতে পারে না।

শোন দস্তা-কন্যা, সব মানুষ একরকম না। কাগজি লেবু গাছ সবই একরকম, কিন্তু প্রতিটি মানুষই আলাদা। আমি আলাদা। তুমি আলাদা।

হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে তুমি গাছে গরম বাতাস দিচ্ছ কেন?

প্রতিটি কাগজি লেবু গাছ একই রকম, তারপরেও এদেরকে মানুষের মতো আলাদা করা যায় কি-না সেই পরীক্ষা করছি। External stimuli দিয়ে পরিবর্তনটা করার চেষ্টা করছি।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি ঠিক সুস্থ না।

সুস্থতা ব্যাপারটা পুরোপুরি আপেক্ষিক। অনেকে হয়তো তোমাকেও অসুস্থ বলবে।

কেন? আমি কী করলাম?

এই যে তুমি সব কিছু ফেলে আমার সঙ্গে ট্যাগ হয়ে আছ, এটা অসুস্থতা? ছায়ার মতো আমার সঙ্গে লেগে আছ। অন্ধকারে ছায়া থাকে না। তুমি। অন্ধকারেও আছ।

তুমি কি আমার কাজে বিরক্ত হচ্ছ?

বিরক্ত হচ্ছি না। আবার পতিপ্রেম দেখে আনন্দে গদগদও হচ্ছি না। আমি সমান সমান আছি।

সমান সমান আছি মানে কী?

সমান সমান আছি মানে তোমার ছায়া-স্বভাব দেখে বিরক্ত হচ্ছি না, আবার খুশিও হচ্ছি না।

ফ্রিজের ভেতর কয়েকটা পলিথিনের প্যাকেট দেখলাম। প্যাকেটে কী?

প্যাকেটে রক্ত। মানুষের রক্ত। বি-পজিটিভ।

রক্ত ফ্রিজে রেখেছ কেন?

তুমি যা ভাবছ তা-না। রক্ত খাবার জন্যে রাখি নি। আমি ভ্যাম্পায়ার না। একটা অ্যাক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে রক্ত এনে রেখেছি।

গাছের গোড়ায় দেবে?

ঠিক ধরেছ। তোমার বুদ্ধি খারাপ না।

দস্তা-কন্যা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার এক দূরসম্পর্কের ভাই আছে। আমাদের বিয়ের সময় সে থাকতে পারে নি। সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে তার বাসায় একবার যাওয়া দরকার। তুমি কি যাবে?

আমি দস্তা-কন্যার চোখের দিকে তাকালাম। সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। মনে হয় তার শ্বাসকষ্টও শুরু হলো। হালকাভাবে শাঁ শাঁ শব্দ শুনছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম দূরসম্পর্কের ভাই টাই কিছু না, দস্তা-কন্যা আমাকে কোনো একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিতে চাচ্ছে। আমি বললাম, কোনো অসুবিধা নেই। তুমি যেদিন বলবে সেদিনই তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসব।

উনি হয়তো উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করবেন, তাতে তুমি কিছু মনে করো না। উনার উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করা স্বভাব।

আমি কিছুই মনে করব না। উনার সব প্রশ্নের জবাব দেব।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

থ্যাংক য়্যু।

তোমার শ্বাসকষ্টটা কি কমেছে?

আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তুমি বুঝলে কী করে?

ভাব-ভঙ্গি দেখে বুঝলাম। তুমি যেমন আমার ভাব-ভঙ্গিতে বুঝে ফেললে আমাকে তোমার দূরসম্পর্কের ভাইয়ের বাসায় নেয়া দরকার, সে-রকম আর কী।

দস্তা-কন্যা হকচকিয়ে গেল। তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বুঝতে পারছি সে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে। সাইকিয়াট্রিস্টের ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলব–এটা সে হয়তো ধারণা করে নি।

দস্তা-কন্যা ক্ষীণ গলায় বলল, চা খাবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ খাব।

সে প্রায় ছুটে গেল চা আনতে।

দস্তা-কন্যার দূরসম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছি। তার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। তিনি আমাকে ঘুমের ওষুধপত্রও দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তো আপনাকে আগেই বলেছি। তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় দফায় আবার দেখা হয় তার গুলশানের চেম্বারে। সেটা আমার জন্যে খুবই ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা। আপনাকে যথাসময়ে বলব। গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করছি, মনে হয় সে-রকম পারছি না। আপনি আমার এই অক্ষমতা নিজগুণে ক্ষমা করবেন। সবচে' ভালো হতো যদি পুরো ব্যাপারটা আমি গুছিয়ে লিখে ফেলতে পারতাম। আমার লেখালেখি আসে না। দস্তা-কন্যার আবার লেখালেখি। খুব আসে। তাকে দেখছি প্রতি রাতেই টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কী যেন লিখে। এক রাতে এরকম লিখছে, আমি নিঃশব্দে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শান্ত গলায় বললাম, কী লিখছ?

সে ঝট করে খাতা বন্ধ করে ভীত গলায় বলল, কিছু না।

আমি বললাম, কিছু না-টা কী? গল্প, উপন্যাস? গল্প, উপন্যাসের আরেক নাম–"কিছু না।

দস্তা জবাব দিল না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ভয় পাচ্ছে–আমি বোধহয় তার কাছ থেকে খাতাটা কেড়ে নিয়ে নেব। আমি বললাম, ভয় পাচ্ছ কেন?

সে বলল, ভয় পাচ্ছি না তো।

আমি বললাম, তোমার যা ইচ্ছা তুমি লিখতে পার। আমি কখনো সেটা পড়ব না। তুমি বোধহয় জানো না, আমি সত্যবাদী।

আমি জানি তুমি সত্যবাদী।

কীভাবে জানো?

মানুষকে দেখে বুঝা যায়।

তাহলে খাতাটা বুকের সঙ্গে চেপে ভয়ে কাঁপছ কেন? তোমার যে অবস্থা কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাবে। সহজ হও তো।

দস্তা সঙ্গে সঙ্গে সহজ হয়ে গেল। হাসল। টেবিলের উপর খাতাটা রাখতে রাখতে বলল, তোমার যদি কখনো ইচ্ছা করে খাতায় কী লিখেছি তা পড়বে, তাহলে পড়তে পার।

আচ্ছা ঠিক আছে।

খাতায় যা লিখেছি সবই আমার নিজের মতামত লেখাটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেবে না।

আচ্ছা নেব না।

সাথী আপা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিল। তুমি কি কথা বলবে?

কেন বলব না? আমি যদি তোমার দূরসম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি–তোমার নিজের বোনের সঙ্গে কেন কথা বলব না!

সাথী আপার স্বভাব হচ্ছে সে চট করে রেগে যায়। যদি রেগে যায়, তুমি কিছু মনে করো না।

উনি রেগে যাবেন সে-রকম কিছু কি আমি করেছি?

না, করো নি। কিন্তু আপার রাগের কোনো ঠিক নেই।

উনি যদি রাগারাগি করেনও আমি কিছুই মনে করব না। শান্ত ভঙ্গিতে তার কথা শুনব।

উনি উনি করছ কেন?

তোমার বড় বোন, আমি উনি উনি করব না?

দস্তা-কন্যা ক্ষীণ গলায় বলল, কী আশ্চর্য ঘটনা, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সে...

দস্তা কথা শেষ করল না। মাঝপথে থেমে গেল। আমি বললাম, উনার সঙ্গে কথা কি টেলিফোনে হবে? না-কি আমাকে তোমাদের বাড়িতে যেতে হবে?

দস্তা হড়বড় করে বলল, বাড়িতে যেতে হবে না। তুমি আমাদের বাড়িতে যেতে পছন্দ কর না, আমি জানি। টেলিফোনে কথা বললেই হবে।

বেশ, টেলিফোন ধরে দাও। আমি সুবোধ বালকের মতো কথা বলব।

এখন বলবে?

হ্যাঁ।

আপা কি হাসপাতালে না বাসায় তা তো জানি না। আচ্ছা দেখি। আপা উল্টাপাল্টা কিছু বললে প্লিজ তুমি কিছু মনে করো না। আপা আমাদের দু'বোনের কাছে মায়ের মতো। ছোটনের জন্মের সময় আমার মা মারা যান। তখন আমার নিজের বয়স তিন বছর। আর আপার বয়স সাত বছর। এই সাত বছরের মেয়েই কিন্তু আমাদের দেখাশোনা করেছে। আপাকে যে আমরা কী পরিমাণ ভালোবাসি, কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করি, সেটা পৃথিবীর কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব না। আমাদের কাছে আপা এক দিকে, আর সমস্ত পৃথিবী এক দিকে।

তাই না-কি?

হ্যাঁ তাই। আপা যদি আমাকে ডেকে বলে–তুই যা ছাদে ওঠ, তারপর ছাদ থেকে লাফ দিয়ে উঠানে পড়ে যা। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা করব।

তোমার আপা যদি বলে, একটা কাজ কর–গ্লাসে ইঁদুর মারা বিষ মিশিয়ে শরবত বানা। তারপর এই শরবত তোর স্বামীকে খেতে দে। তুমি দেবে?

দস্তা হতাশ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার মনে হয় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাচ্ছে। হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কপালে ঘাম। আমি বললাম, তুমি এরকম ভাব করছ যেন সত্যি সত্যি তোমার আপা তোমাকে ইঁদুর মারা বিষের শরবত বানাতে বলেছে। সহজ হও তো।

দস্তা সহজ হবার চেষ্টা করতে করতেই টেলিফোন সেটের কাছে গেল। তার আপাকে সম্ভবত পাওয়া গেছে। দস্তা ইশারায় আমাকে ডাকছে।

আমি টেলিফোন রিসিভার হাতে নিয়ে নরম গলায় বললাম, কেমন আছেন?

সাথী সৌজন্যমূলক প্রশ্নের উত্তরের ধার দিয়েও গেল না। কঠিন গলায় বলল, আপনি আমার বোনকে দস্তা নামে ডাকেন কেন? এটা কোন ধরনের রসিকতা? দস্তা আবার কী?

আমি বললাম, আপনার তো বিয়ে হয় নি, সেই জন্যে আপনি জানেন না। স্বামীরা তাদের নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে অনেক রহস্য করে। স্ত্রীর নাম পাল্টে তার পছন্দের নাম দেয়া একটা সাধারণ ব্যাপার।

সেই পছন্দের নাম দস্তা? আপনি কখনো তাকে দস্তা ডাকবেন না। কখনো না।

আচ্ছা এখন থেকে ডাকব না। এখন থেকে রূপা ডাকব।

আপনি রূপাকে আটকে রেখেছেন কেন?

আটকে রাখি নি তো।

অবশ্যই আটকে রেখেছেন। আটকে রেখেছেন বলে সে তার অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসতে পারছে না।

উনি অসুস্থ না-কি?

কী আশ্চর্য, আপনি জানেন না যে বাবা অসুস্থ?

না, আমি জানি না।

রূপা আপনাকে বলে নি?

না, বলে নি।

আপনাকে বলে নি কারণ সে জানে আমাদের বাবা অসুস্থ–এই খবরে আপনার কিছু যায় আসে না। আপনি আমার কথা শুনুন–আমার বোনকে আটকে রাখবেন না। তাকে এখুনি

আমাদের বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। বাবার শরীর কতটা খারাপ তা আমি জানি। আমি একজন ডাক্তার।

এখন তো রাত অনেক হয়েছে।

যত রাতই হোক আপনি তাকে পাঠান। আপনার কোনো অধিকার নেই আমার বোনকে আটকে রাখার।

আমি তাকে পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনি ভুল করছেন—আমি তাকে আটকে রাখি। নি। কেন শুধু শুধু তাকে আটকে রাখব?

আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মানুষ। আপনার পক্ষে তাকে তালাবন্ধ করে রাখা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আর কিছু বলবেন?

না, আর কিছু বলব না।

আমার একটা প্রশ্ন ছিল। অভয় দিলে প্রশ্নটা করি। আপনি যে-রকম রেগে আছেন প্রশ্ন করতে ভরসা পাচ্ছি না।

কী প্রশ্ন?

আপনারও কি রূপার মতো শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে? শ্বাসকষ্ট হলো। অনেকটা সাইকোসমেটিক ডিজিজ। যেহেতু আপনাদের তিন বোনের ভেতর অস্বাভাবিক মিল, সেহেতু সাইকোসমেটিক ডিজিজগুলিও তিনজনেরই হবার কথা।

আমার সঙ্গে জ্ঞান কপচাবেন না।

সাথী খট করে টেলিফোন রেখে দিল। আমি দস্তা-কন্যার দিকে তাকিয়ে। বললাম, রূপা, বাবাকে দেখতে যাবে, তৈরি হও।

দস্তা-কন্যা অবাক হয়ে বলল, তুমি আমাকে রূপা ডাকছ কেন? তুমি রূপা ডাকবে না। তুমি দস্তা ডাকবে।

গাড়িতে করে রূপাকে একাই তাদের বাড়িতে পাঠালাম। সে এমন ভাব করতে লাগল যেন দীর্ঘদিনের জন্যে বহুদূর দেশে যাচ্ছে। সম্ভাবনা এরকম যে আর ফিরবে না। তার চোখে অশ্রুবিন্দুও দেখা গেল। সে ধরা গলায় বলল, আমি কিন্তু রাতে থাকব না। আমি ফিরে আসব। তুমি ঘুমুবে না। তুমি অবশ্যই জেগে থাকবে। অবশ্যই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

আমি বললাম, আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু রূপা, তুমি কাঁদছ কেন?

রূপা চোখ মুছতে মুছতে বলল, তোমাকে না বললাম আমাকে রূপা ডাকবে না? দস্তা ডাকবে।

সূচিপত্র

রূপাকে নামিয়ে গাড়ি ফিরে এলো। জানা গেল, তার বোনরা তাকে রেখে দিয়েছে। রাতটা সে বোনদের সঙ্গে থাকবে।

মানুষ আর কিছু পারুক না-পারুক দ্রুত অভ্যস্ত হতে পারে। ট্যানারির পাশে যার বাসা, সে চামড়ার গন্ধে অভ্যস্থ হয়ে যায়। নির্মল আলো-বাতাসে তার সারাক্ষণ মনে হয়–জীবন থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কী যেন একটা চলে গেছে। রাতে ঘুম হয় না। ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাসে কষ্ট হয়।

রূপার সঙ্গে আমি অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। এক রাতের জন্যে সে নেই, আমার মনে হলো–এ কী! আমি কোথায়? নিজের বাড়িটাও আমার কাছে অচেনা মনে হতে লাগল। রাত একটার পর থেকে ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হলো লাইব্রেরি ঘরে কে যেন হাটছে, বই নাড়াচাড়া করছে।

বারান্দার চেয়ার ধরে টানাটানির শব্দ পেলাম। এই শব্দটা স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে বানরগুলি বারান্দায় চলে এসে চেয়ার টানাটানি করে। তবে তখন তাদের কিচকিচ শব্দ শোনা যায়। এখন কোনো কিচকিচ শব্দ শোনা যাচ্ছে না। একবার মনে হলো–বারান্দায় গিয়ে দেখে আসি ঘটনা কী। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, যদি দেখি কিছুই নেই, বারান্দা শূন্য, তাহলে ভয় পাব। এরচে' না দেখাই ভালো।

ভূতের ভয় কাটানোর দুটি পদ্ধতি আছে। দু'টি পদ্ধতির একটি হলো, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যাওয়া। নগ্ন হয়ে হাঁটাহাঁটি করা। যে ভূতের ভয়ে অস্থির হয়ে আছে, নগ্ন হওয়া মাত্র তার

সব ভয় কেটে যাবে। নগ্ন হবার কারণে তার ভেতরে প্রবল লজ্জার বোধ তৈরি হবে। লজ্জাবোধ, ভয়বোধকে কাটিয়ে দেবে। অনেকটা মেটার এন্টিমেটারের এনিহিলেশনের মতো।

ভয় কাটানোর দ্বিতীয় উপায় হলো, ভূতের বই পড়তে শুরু করা। বিষে। বিষক্ষয়।

আমি রাতের খাওয়া শেষ করে একটা ভূতের বই হাতে নিয়ে বিছানায় গেলাম। পাতা খুলে পড়তে শুরু করেছি, তখনি শুনলাম পাশের ঘরে চামচের শব্দ। কেউ যেন চা বানাচ্ছে। এই একটা কাপে চামচ নাড়ল, এই সে দ্বিতীয় কাপে চামচ নাড়ছে। চা সম্ভবত দু'কাপ বানানো হচ্ছে।

এমন কি হতে পারে যে কাজটা বানর করছে? বানর অনুকরণ করতে খুবই ভালোবাসে। সে রূপাকে চা বানাতে দেখেছে। এখন অনুকরণ করছে। বানরের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বাতিল করতে হলো। কারণ বানরের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যে পুরো বাড়ি নেট দিয়ে ঘেরা। শুধু বারান্দার একটা অংশ খালি। যেখানে আমি বানরের সঙ্গে কথা বলি।

তাহলে চামচ কে নাড়ছে? আমার হেলুসিনেশন হচ্ছে? পুরাতন ব্যাধি মাথাচাড়া দিচ্ছে? হেলুসিনেশন কোনো ব্যাধি না, হেলুসিনেশন হলো আধি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—

'ব্যাধির চেয়ে আধি হলো বড়'

ব্যাধি শরীরের রোগ। আধি মনের রোগ। আমাকে কোনো ব্যাধিতে ধরে নি, আমাকে ধরেছে আধিতে। শরীরের ব্যাধিকে উপেক্ষা করে সে ব্যাধি সারানো যায় না। টাইফয়েড

হলে ক্লোরোমাইসিটিন লাগবে। নিউমোনিয়া হলে পেনিসিলিন নিতে হবে। মনের আধিকে হয়তো উপেক্ষা করে সারানো যায়। আমি চায়ের কাপের চামচের শব্দ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলাম–বই পড়তে শুরু করলাম। লেখক যথেষ্ট জমাট ভূতের গল্প ফেঁদেছেন। পরিবেশ সুন্দর তৈরি করেছেন।

একজন যাত্রী দূরপাল্লার ট্রেনে যাচ্ছেন। প্রথম শ্রেণীর কামরায় তিনি একা। রাত এগারোটার মতো বাজে। শীতের রাত। ভালো শীত পড়েছে। বাইরে ঘন কুয়াশা। জানালা দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারপরেও তিনি দীর্ঘ সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। একা একা তিনি 'বোর হচ্ছিলেন। ব্যাগ খুলে হুইস্কির বোতল খুলে নির্জলা হুইস্কি এক সঙ্গে অনেকখানি খেয়ে ফেললেন। তার ভালো নেশা হয়ে গেল। শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। ঘুমও পেল। কম্বল গায়ে জড়িয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। ট্রেনের ঝাকুনিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড শীতে। তিনি দেখলেন ট্রেনের কামরার প্রতিটি জানালা খোলা। জানালা দিয়ে হু-হু করে বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। অবাক হয়ে দেখলেন...

গল্পের এই পর্যায়ে আমার ঘরের দরজার পাশে খুট করে শব্দ হলো। আমি বললাম, কে?

দরজার আড়াল থেকে অবিকল রূপার গলায় কেউ একজন বলল, আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। চা খেয়ে আসুন।

আমি হাতের বই রাখলাম। পাশের ঘরে গেলাম। সেখানে সত্যি সত্যি পিরিচে ঢাকা চা। আমি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলাম। চায়ে চুমুক দিলাম। দরজার আড়াল থেকে নারীকণ্ঠ বলল, চায়ে চিনি হয়েছে?

আমি বললাম, হয়েছে। তুমি কি কাঁসা-কন্যা?

(হাসি)

দরজার আড়ালে কেন? সামনে আস।

(হাসি।) (চুড়ির টুনটুন শব্দ।)।

কাঁসা-কন্যা, তুমি কি জানো যে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই? তুমি হচ্ছ আমার কল্পনা।

জানি না।

আমার ভয়ঙ্কর একটা রোগ হয়েছে। রোগটার নাম আধি।

আধি আবার কেমন রোগ? মনের রোগ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ঔষধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছ?

শুনেছি।

তা তো শুনবেই। আমি যা যা জানি, তুমিও তা জানো। আমার সমস্ত জ্ঞানই তোমার মধ্যে আছে।

তাহলে আধি কী জানলাম না কেন?

তারও ব্যাখ্যা আছে–তোমাকে পুরোপুরি আমার মতো করে তৈরি করলে খেলাটা জমে না। খেলা জমানোর জন্যে এটা করা হয়েছে। তোমাকে সামান্য অন্যরকম করা হয়েছে। যাতে আমাকে বিভ্রান্ত করা যায়।

কে আপনাকে বিভ্রান্ত করছে?

আমিই আমাকে বিভ্রান্ত করছি। সাপ হয়ে দংশন করছি, আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ছি।

(হাসি)

হাসছ কেন?

(আবারো হাসি)

তুমি যে মিষ্টি করে একটু পরপর হেসে উঠছ তারও কিন্তু ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাটা হলো– কেউ হাসলে আমার ভালো লাগে। কেউ কাঁদলে কিংবা মন। খারাপ করে থাকলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তখন ইচ্ছা করে যে কাঁদছে তাকে আরো কাঁদিয়ে দেই। আমি এরকম কেন হয়েছি–শুনতে চাও?

চাই।

আমি বড় হয়েছি কান্নার শব্দে। আমার মা নানাবিধ দুঃখ-কষ্টে সবসময় কাঁদতেন। আমার দু'বোন কাঁদত। যখন বাবা নেশা করতেন তিনিও হো হো শব্দ করে কাঁদতেন। আমাদের বাড়িটা ছিল কান্নার বাড়ি। সেই বাড়িতে একজন শুধু হাসত।

সে কে?

আমার মেজ বোন। সে সব কিছুতেই হাসত।

আমার মতো?

হ্যাঁ, তোমার মতো। মেজ বোনের বয়স যখন দশ বছর, তখন সে বাবার উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। আর কোনোদিন ফিরে নি।

সে কী!

তুমি এতে চমকে উঠলে কেন? তুমি তো সবই জানো। আমি যা জানি তুমিও তা জানো।

আপনার সেই বোন এখন কোথায়?

জানি না কোথায়। সে হারিয়ে গেছে।

তাকে খোঁজার চেষ্টা করা হয় নি?

মানুষের পক্ষে সম্ভব সব চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা মাসের পর মাস এই ভেবে কাটিয়েছি যে সে ফিরে আসবে।

আপনি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আর কথা বলবেন না। শুয়ে পড়ুন। পানি খাবেন? বরফ দেয়া ঠাণ্ডা পানি?

হ্যাঁ খাব।

আমি দরজার দিকে তাকিয়ে আছি আমি নিশ্চিত যে আজ সে যখন দরজার আড়াল থেকে বের হবে তখন তাকে দেখা যাবে। কল্পনা-কন্যা বাস্তবে রূপ নেবে।

যা ভেবেছি তাই হলো। আমি কাঁসা-কন্যাকে এক ঝলক দেখলাম। সে দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল।

সে দেখতে কেমন?

রূপার মতো। আমার মস্তিষ্ক কল্পনায় অচেনা কোনো মেয়েকে তৈরি করে নি। অচেনা মেয়ে তৈরি করা তার জন্যে কষ্টকর হতো। সে চেনা একজনকেই তৈরি করেছে।

ভাই সাহেব, আমি আমার জীবন-গল্পের কঠিন একটা সময়ে চলে এসেছি। আমার জীবনে দু'টি বিশেষ ঘটনা এই সময় ঘটে।

এক. কাঁসা-কন্যাকে প্রথমবার কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে পাই।

দুই. আমার শ্বশুরসাহেব মারা যান।

আমার শ্বশুরসাহেবের মৃত্যুর খবর অবশ্যি সেই রাতে পাই না। খবরটা আসে পরদিন ভোরে।

কোনো জামাইয়ের কাছেই তার শ্বশুরের মৃত্যু বিশেষ ঘটনা না। আমার কাছে বিশেষ ঘটনা, কারণ শ্বশুরসাহেবের মৃত্যুর পর রূপার দুই বোন বাস করার জন্যে আমার বাড়িতে উঠে এলো। ঐ বাড়িতে তারা থাকতে পারছিল না। ভয় পাচ্ছিল।

আপনি কি এডগার এলেন পো'র নাম শুনেছেন? আমেরিকান কবি ও গদ্যকার। তাঁর মূল আগ্রহ ছিল Supernatural-এর দিকে। বিখ্যাত সব ভূতের গল্প লিখেছেন। তাঁর অনেক গল্প নিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবিও হয়েছে। ঢাকায় এসেছে Pit and the pendulum. উনার গল্প ঠিকঠাক পরিবেশে পড়লে 'ঘুম খতম পয়সা হজম হয়ে যাবে।

অদ্ভুত অদ্ভুত কায়দায় খুনের বর্ণনা তার লেখায় পাওয়া যায়। একটা খুন কীভাবে করা হয় তার সামারি এন্ড সাবসটেন্স আপনাকে বলি। অসুস্থ বৃদ্ধ একজন মানুষ। রোজ গভীর রাতে খুব সাবধানে তার ঘরের দরজা খোলা হয়। বৃদ্ধের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। বৃদ্ধ দেখতে পান। তাঁর ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হলো। তিনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেন–কে কে? কেউ জবাব দেয় না। বৃদ্ধের ভয় তুঙ্গস্পর্শী হয়, তিনি থরথর করে কাঁপতে। থাকেন। এই পর্যায়ে খোলা দরজার ফাক দিয়ে তাঁর চোখে ফেলা হয় লণ্ঠনের আলো। বৃদ্ধ মারা যায় চোখে হঠাৎ আলো পড়ার ভয়ে এবং অস্বাভাবিক উত্তেজনায়।

অল্প যে কয়টি ভূতের গল্প আমাকে অভিভূত করেছে–এলেন পো'র এই গল্প তার একটি। আমি সবচেয়ে বেশিবার সম্ভবত এই গল্পটিই পড়েছি। গল্পটি আমাকে এত অভিভূত কেন করেছে তার কারণটা বলি। এই গল্প পড়েই প্রথম বুঝতে পারি মৃত্যু খুবই সহজ ব্যাপার। একটি মানুষকে খুন করার জন্যে ছুরিকঁচি, বন্দুক কিছুই লাগে না। কায়দামতো সামান্য ভয় দেখাতে পারলেই হয়।

তবে গল্পের মৃত্যু এবং বাস্তবের মৃত্যু একরকম নাও হতে পারে। চোখে আলো ফেলে গল্পে হয়তোবা একজনকে মারা সম্ভব। বাস্তবে কি সম্ভব? আমি ঠিক করলাম ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখব। আমি চোখে আলো ফেলবার জন্যে পাঁচ ব্যাটারির একটা টর্চ কিনলাম।

আরে না না, এখনকার কথা বলছি না। সাত-আট বছর আগের কথা বলছি। আমার মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রবণতা আছে। সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করলে আমি হয়তোবা

ভালো সায়েন্টিস্ট হতাম। দুঃখের ব্যাপার হলো, আমি এমন বিষয়ে পড়াশোনা করেছি যেখানে হাতে-কলমে গবেষণার সুযোগ নেই।

আমার পড়াশোনার বিষয় দর্শন। এই বিষয়টা এমন যে এর সাহায্যে ঈশ্বর আছেন এই বিষয়ে একশ' প্রমাণ দেয়া যায়, আবার ঈশ্বর নেই এই বিষয়ে একশ' প্রমাণ দেয়া যায়। খুবই মজার ব্যাপার।

শুধুমাত্র চোখে আলো ফেলে 'THE END' খেলাটা আমি খেলতে পারি নি, কারণ আমাদের বাড়িতে গুরুতর অসুস্থ কেউ ছিল না। গুরুতর কেন, মোটামুটি অসুস্থও কেউ নেই। এই বাড়িতে সুস্থ-সবল লোকজন বাস করে।

রূপার দুই বোন যখন থাকতে এলো তখন হঠাৎ করে মনে হলো–মন্দ না। THE END-খেলা খেলা যেতে পারে। এই দুই বোন অসুস্থ না, খুবই সুস্থ; তবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। বাবার মৃত্যু তারা নিতেই পারছে না। তাদের দেখে মনে হচ্ছে তাদের জগৎ-সংসার কপূরের মতো উড়ে গেছে। তারা এখন আর মানুষের পর্যায়ে নেই, জম্বি পর্যায়ে।

জম্বি চেনেন তো? জম্বি হলো মৃত মানুষ যারা জীবিতদের মতো জীবনযাপন করে। জিন্দালাশ বলতে পারেন। আমার বাড়িতে থাকতে এসে তারা খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগল। বিশেষ করে রূপার বড় বোন সাথী। তারা তাদের নিজের বাড়িতে থাকতে পারছিল না। সেখানে নানান সমস্যা। সন্ধ্যা। মিলাবার পরপরই না-কি চটি ফটফট করে কে হাঁটে। মাঝে মাঝে দরজার কাছাকাছি এসে চটির শব্দ থেমে যায়। দরজা খুললে দেখা যায় কেউ নেই।

আমরা এই ঘটনাটাকে বলতে পারি ‘চটি ভূতের উপদ্রব। তিন বোনের কাছে চটি ভূত এত ভয়ঙ্কর কেন তা জানতে হলে তার বাবার মৃত্যুর সময়ের কথাটা বলতে হয়। ভদ্রলোক শ্বাসকষ্ট এবং বুকের ব্যথায় ছটফট করছিলেন। মেয়েরা ছোটাছুটি করছিল কীভাবে ডাক্তারের কাছে বাবাকে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বুদ্ধি বের করার জন্যে। তাদের বাসার টেলিফোন কাজ করছিল না। তারা পর্যায়ক্রমে ছুটে দোতলার বারান্দায় যাচ্ছিল যদি সেখান থেকে কোনো রিকশা বা বেবিট্যাক্সি দেখা যায়। অন্য সময় সারারাতেই তাদের বাড়ির সামনে রিকশা বা বেবিটেক্সি দেখা যায়। সেই রাতে কিছুই ছিল না।

এমন অবস্থায় সোবাহান সাহেবের বুকের ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, পানি খাব। ঠাণ্ডা পানি।

রূপা দৌড়ে পানি নিয়ে এলো। তিনি পানির গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, আধা গ্লাস পানি এনেছিস কী করে? পুরো গ্লাস আন। তৃষ্ণা পেয়েছে।

রূপা গ্লাস ভর্তি পানি নিয়ে এলো। তিনি এক চুমুকে তৃপ্তি নিয়ে পানি শেষ করে বললেন, বাথরুমে যাব। চটিজুতা জোড়া আন।

চটিজুতা জোড়া খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁর ছোট মেয়েটা স্পঞ্জের স্যান্ডেল এনে দিয়ে বলল, চটি পাওয়া যাচ্ছে না, স্পঞ্জের স্যান্ডেল পর।

সোবাহান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, চটিজুতা জোড়া যাবে কোথায়? ঘরেই আছে, খুঁজে বের কর।

তিন বোন ব্যাকুল হয়ে চটিজুতা খুঁজতে লাগল। তিনি কিছুক্ষণ পর পর খোঁজ নিচ্ছেন– এই, পাওয়া গেছে? আমার যে বাথরুমে যেতে হবে ভুলে। গেছিস! তিন ধুমসি মিলে করছিস কী? চটি জোড়া খুঁজে বের করতে পারছিস না?

সাথী এসে কোমল গলায় বলল, বাবা, তোমার শরীরটা খারাপ। এইভাবে চিৎকার করবে না।

আমার বাথরুমে যেতে হবে না? আমি কি বিছানায় হেগে দেব? তোরা তাই চাস?

স্পঞ্জের স্যান্ডেলটা পরে যাও বাবা।

অবশ্যই আমি স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরব না। তোরা যেখান থেকে পারিস চটি জোড়া খুঁজে আন। প্রয়োজনে আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্যকে দিয়ে আমার চটি এনে দিবি। তিন ধুমসি, কাজ নেই কর্ম নেই, শুধু গুটুর গুটুর, শুধু রঙ-তামাশা। রঙ-তামাশা অনেক সহ্য করেছি, আর না...

এই বলে চিৎকার করতে করতেই তাঁর স্ট্রোক হলো। Cerebral Stroke. সেই স্ট্রোকেই মৃত্যু।

সেরিব্রেল স্ট্রোকের বাংলা জানেন? বাংলা হলো ‘সন্ন্যাস রোগ’। সন্ন্যাসীরা কী করে? তারা তাদের অতি প্রিয় বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আর ফিরে আসে না। সন্ন্যাস রোগে প্রাণবায়ু তার ঘর অর্থাৎ তার শরীর ছেড়ে চলে যায়। আর ফিরে। আসে না।

কী বলতে কী বলছি, মূল অংশে আসি। রূপার বাবা চটি চটি' করতে করতে মারা গেলেন। মৃত্যুর পর পরই চটি পায়ে তার হাঁটার শব্দ শোনা যেতে লাগল। তিন বোনই শুনল। চটর চটর শব্দ হচ্ছে। এই তিনি যাচ্ছেন বাথরুমের দিকে, এই গেলেন বারান্দায়। চটির শব্দের সঙ্গে তাঁর খুকখুক কাশিও কয়েকবার শোনা গেল। ভয় এবং তীব্র আতঙ্কে তিন বোনই জমে গেল। মৃত্যুশোকের বদলে তাদের গ্রাস করল তীব্র ভয়।

আপনি কি বুঝতে পারছেন চটির শব্দ শোনার পেছনে কাজ করছে–মানসিক অবসাদ এবং তীব্র ঘোর? মানুষের আত্মা (যদি থেকে থাকে) নিশ্চয়ই চটি পায়ে হাঁটাহাঁটি করবে না। সোবাহান সাহেব যদি মরে ভূত হয়েও থাকেন তারপরেও সেই ভূত নিশ্চয়ই তার তিন অসহায় মেয়েকে ভয় দেখাবে না। এটা হলো সাধারণ যুক্তি। ভয় যুক্তি মানে না–তিন বোন তাদের ভূত-পিতার ভয়েই অস্থির হয়ে আমার বাড়িতে উঠে এলো।

আমি যথেষ্টই বিরক্ত হলাম। একা থেকে আমার অভ্যাস। আমার কোনো কাজের লোকেরই যেখানে দোতলায় আসার হুকুম নেই, সেখানে তিন কন্যা দোতলায় বাস করবে–এটা মেনে নেয়া আমার জন্যে খুব কঠিন। তারপরেও আমি তাদের সঙ্গে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করলাম। সাথী বিব্রত গলায় বলল, কয়েকটা দিন শুধু থাকা।

আমি বললাম, আপনার যত দিন থাকতে ইচ্ছা হয় থাকবেন। কোনো সমস্যা নেই।

সাথী বলল, আপনার সমস্যা না থাকতে পারে, আমার সমস্যা আছে। আমি কেন বোনের স্বামীর বাড়িতে বাস করব?

আমি বললাম, সমস্যায় পড়েছেন বলে বাস করছেন। শখ করে তো থাকছেন না।

সাথী বলল, আপনার তো অনেক লোকজন আছে, আপনি তাদেরকে বলেন আমাকে দু'রুমের ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে দিতে। আমি ছোটনকে নিয়ে সেখানে থাকব।

নিজের বাড়িতে যাবেন না?

না।

চটির ফটফট শব্দ শুনবেন বলে ভয় পাচ্ছেন?

সাথী রাগী গলায় বলল, যে ঘটনা ঘটেছে সেটা নিয়ে দয়া করে হাসিতামাশা করবেন না। আমি হাসি-তামাশা পছন্দ করি না। আমার সেন্স অব হিউমার নিম্ন পর্যায়ের।

আমি বললাম, আপনার লজিক সেন্স অব হিউমারের চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের।

তার মানে কী? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

আমি শান্ত গলায় বললাম, অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে উঠে কিন্তু আপনি চটির শব্দ থেকে বাঁচতে পারবেন না। চটির শব্দ আপনার পেছনে পেছনে সেখানেও উপস্থিত হবে। কারণ চটির শব্দটা হয় আপনার মস্তিষ্কে। কেউ চটি পরে আপনাকে ভয় দেখায় না। আমার ধারণা এই বাড়িতেও আপনারা চটির শব্দ শুনবেন। হয়তো আজ রাতেই শুনবেন।

সাথী অসম্ভব বিরক্ত গলায় বলল, জ্ঞানী জ্ঞানী কথা আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে করবেন। সে জ্ঞানী কথা শুনতে পছন্দ করে। আমি করি না। আর আপনি আরেকটা কথা ভুলে

যাচ্ছেন। কথাটা হলো আমি একজন ডাক্তার। যে মানসিক কারণ আপনি বলছেন সেই কারণ আমি জানি। আমাকে শেখাতে হবে না।

আর শেখাব না।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউস খুঁজে দিতে বলেছি, দয়া করে খুঁজে দিন। এই বাড়িতে তিন-চার দিনের বেশি আমি থাকতে পারব না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমি বললাম, আমার সঙ্গে শেষপর্যন্ত বিয়ে না হয়ে তাহলে ভালোই হয়েছে। বিয়ে হলে দমবন্ধ অবস্থায় জীবন কাটাতে হতো।

সাথী কঠিন গলায় বলল, আপনার-আমার বিয়ের প্রসঙ্গটা আপনি আর কখনো তুলবেন না। কখনো না।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

আপনি আপনার মতো থাকবেন। আমরা দু'বোন থাকব আমাদের মতো। আমরা আপনাকে বিরক্ত করব না। দয়া করে আপনিও আমাদের বিরক্ত করবেন না।

আমি বিনীতভাবে বললাম, জি আচ্ছা।

সাথী বলল, আমরা আমাদের মতো করে খেয়ে নেব। সবাই এক সঙ্গে বসে খাওয়া–এইসব ফর্মালিটির মধ্যে আমাদের টানবেন না। প্লিজ।

জি আচ্ছা।

সাথী আমার 'জি আচ্ছা' বলা শেষ করার আগেই হুট করে উঠে চলে গেল। ঠিক তখনি আমার মনে হলো এডগার এলেন পো'র THE END খেলাটা এই কঠিন মহিলার সঙ্গে খেলা যেতে পারে।

আপনি যা ভাবছেন তা কিন্তু না। আমার মাথায় খুনের কোনো পরিকল্পনা ঘুরছিল না। আমি ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাচ্ছিলাম, সাথী নামের আমার হলেও হতে পারত স্ত্রীকে মানসিক একটা ধাক্কা দিয়ে দেখতে চাচ্ছিলাম কী হয়। সে এখন এমনিতেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় ছোট্ট ধাক্কাই কাজ করে। গভীর রাতে হঠাৎ তার চোখে তীব্র আলো ফেলা। ভয়টাকে আরো জমানোর জন্যে আমাকে এক জোড়া চটিজুতা জোগাড় করতে হবে। চটিতে ফটফট শব্দ করতে করতে তাদের ঘরের জানালার সামনে দাঁড়াব। খুব সাবধানে জানালার পর্দা সরিয়ে তার মুখে পাঁচ ব্যাটারির টর্চের তীব্র আলো ফেলে আবার চটির ফটফট শব্দ করে চলে আসব।

এই কাজটার জন্যে বিশেষ একটা রাত বের করতে হবে। ঝড়-বৃষ্টির রাত, যে রাতে ইলেকট্রিসিটি থাকবে না। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো বৃষ্টির শব্দ হতে থাকবে।

আমি এক্সপেরিমেন্টটা করি মে মাসের উনিশ তারিখ রাত দু'টায়। রাতটা ছিল ঝড়-বৃষ্টির। এক্সপেরিমেন্টের জন্যে রাতটা শুভ ছিল না। কারণ ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বিদ্যুৎ

চমকানোর কারণে চোখে আলো পড়লে সেই আলোটা স্বাভাবিক মনে হবে। মনে হবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ভয়টা সে-রকম লাগবে না।

আমি সে-কারণেই টর্চের মুখে লাল কাগজ লাগিয়ে আলোটাকে লাল করে ফেললাম।

যথাসময়ে আলো ফেলা হলো। যে-রকম হবে ভেবেছিলাম সে-রকম হলো। সাথী ক্ষীণ স্বরে একবার বলল, কে? তারপরে গোঙানির মতো আওয়াজ করে চুপ করে গেল। আমি হতাশ হয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। তখনো বুঝতে পারি নি সাথী মারা গেছে।

৫. আমাকে খুনি বলছেন কেন

আমাকে খুনি বলছেন কেন?

আমি খুন করি নি। খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি সামান্য ভয় দেখিয়েছি। আমাদের সমাজে ভয় দেখানো নিষিদ্ধ না। আমরা সবসময় কাউকে না কাউকে ভয় দেখাচ্ছি। আপনি আপনার নিজের কথা চিন্তা করুন। আপনি নিশ্চয়ই আপনার এক জীবনে অনেককে ভয় দেখিয়েছেন। কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই বলেছেন–জানে মেরে ফেলব, বদমাশ কোথাকার! ভূত সেজে কাউকে ভয় দেখান নি? অবশ্যই দেখিয়েছেন। আপনার ভয় দেখানোতে কেউ মারা যায়। নি। আমার ক্ষেত্রে একজন দুর্বল হার্টের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে মারা গেছে। এতেই আমি খুনি হয়ে গেলাম? আপনার হিসাব-নিকাশ তো অদ্ভুত!

উনিশ শ’ একাত্তর সনের একটা গল্প বলি। মুক্তিবাহিনী ইন্ডিয়ান আর্মি নিয়ে আমাদের গ্রামে ঢুকেছে। রশীদ মণ্ডল নামের নিতান্তই নিরীহ একজনের সঙ্গে তাদের দেখা। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কী মনে করে রশীদ মণ্ডলের হাত চেপে ধরে বলল, এই তুই কি রাজাকার?

সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করে রশীদ মণ্ডল মারা গেল। এখন আমরা কি মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারকে খুনি বলব? মানুষ খুন করার দায়ে আদালতে কি তার বিচার হবে?

তবে একটা কথা ঠিক যে, মানুষকে বিচার করা উচিত তার কর্মের পেছনের উদ্দেশ্য দিয়ে। কর্ম দিয়ে নয়। উদ্দেশ্য যদি হয় ভয় দেখিয়ে মজা করা, তাহলে কোনো অপরাধ হবে না। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি হয় ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলা, তাহলে অবশ্যই অপরাধ হবে।

ভয় দেখিয়ে সাথীকে মেরে ফেলব–এরকম উদ্দেশ্য আমার ছিল না। এই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই অপরাধী না, তবে তার ছোটবোনের মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারেন। কোনো প্রমাণ অবশ্যি নেই। আদালত আমাকে দোষী প্রমাণ করে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারবে না। তবে আমি দোষী ঠিকই। দ্বিতীয় মৃত্যুটা অবশ্যই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

আচ্ছা ভাই, আপনি এত অস্থির হয়ে পড়েছেন কেন? ঠাণ্ডা মাথায় আগে গল্পটা শুনুন। একজন সিজিওফ্রেনিক রোগী খোলামেলাভাবে তার গল্প বলছে। আপনার তো উচিত মন দিয়ে শোনা। আপনি একজন লেখক মানুষ। লেখকরা। গল্প খুঁজে বেড়ায়, সেখানে আপনাকে কোনো খোঁজাখুঁজি করতে হয় নি। আমি নিজেই গল্প নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। মানুষ খুব সহজ প্রাণী'–এরকম কেন ভাবছেন? কেন ভাবছেন মানুষের মস্তিষ্ক শূন্য আকাশের মতো নির্মল?

'সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারিধার–
সবে বলে, পরিষ্কার অতি পরিষ্কার'!
দুর্বোধ্য যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল!

কার কবিতা বলুন তো? ঠিক ধরেছেন–রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট'। কবিতাটা কখন লেখা হয়েছে, কোথায় লেখা হয়েছে, বলতে পারবেন?

পারবেন না। কারণ আপনি আমার মতো খুঁটিয়ে পড়েন না। বেশিরভাগ মানুষই পড়ে না। বেশিরভাগ মানুষ জলের উপর উড়াউড়ি করে। জল স্পর্শ করে না। আমি করি। হিং টিং ছট' কবিতাটা লেখা হয়েছে শান্তিনিকেতনে। প্রচণ্ড গরমের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে। বাইরের উত্তাপ তাঁর কবিতাতেও চলে এসেছে—

গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে ভারি উগ্রমূর্তি
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোটা কুর্তি।

দেখেছেন আমি কত মন দিয়ে পড়ি? মন দিয়ে যেমন পড়ি–জীবনটাকে সে-রকম মন দিয়েই দেখার চেষ্টা করি। জীবনের ব্যাখ্যায় আমি ভুল করতে পারি কিন্তু জীবনকে দেখায় কোনো ভুল নেই।

আপনারা মানুষের মাথার ভেতরের আলোকিত করিডোরগুলি জানেন, কিন্তু অন্ধকার করিডোরগুলি জানেন না। জানতে চানও না। আমি জানতে চাই।

গল্পে ফিরে যাই?

পৃথিবীতে তিন রকম বাড়ি আছে। সাধারণ বাড়ি; যেখানে লোকজন কখনো হাসে, কখনো কাঁদে।

কান্না বাড়ি; যেখানে সবসময় কেউ না কেউ কাদছে।

হাসি বাড়ি; যেখানে কেউ না কেউ সবসময় হাসছে।

সাথীর মৃত্যুর পর আমার বাড়িটা হয়ে গেল কান্না বাড়ি। দুই বোন সবসময় কাঁদছে। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে তাদের কান্না দেখতে লাগলাম। অনেক কিছু লক্ষ করলাম, যা আগে লক্ষ করি নি। যেমন, দীর্ঘস্থায়ী কান্না যখন চলে তখন এক সময় চোখের পানি শুকিয়ে যায়। শুরু হয় অশ্রুশূন্য কান্না। আবার চোখে পানি আসে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মাথায়।

কী বললেন, সাথীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে কেউ সন্দেহ করেছে না-কি?

না তো! সন্দেহ কেন করবে? তাছাড়া আমি তো রূপা এবং তার ছোটবোনকে বলেছি যে আমি জানালা দিয়ে সাথীর মুখে টর্চের আলো ফেলেছি। আমি সত্য গোপন করি নি। তবে পূর্ণ সত্য বলি নি। আমি বলেছি Half truth. অর্ধ সত্য মিথ্যার চেয়েও খারাপ। এটা তো নিশ্চয়ই জানেন।

টর্চলাইটের ব্যাপারটা আমি কীভাবে বলেছি শুনুন। আমি রূপাকে বলেছিঝড়-বৃষ্টি যখন হচ্ছিল, তখন আমি বারান্দায় বসা। আকাশে বিজলি চমকাচ্ছে, তাই দেখছি। হঠাৎ শুনলাম তোমার আপা বলছে–কে কে? কথা শুনে মনে। হলো ভয় পেয়েছে। ব্যাপার কী দেখার জন্যে আমি টর্চলাইট নিয়ে গেলাম–জানালা দিয়ে টর্চ ফেললাম। দেখি কিছু না। তিনি তার ছোট বোনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছেন। আমি চলে এসেছি। তখন যদি জানতাম এমন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে, তাহলে...

দেখলেন সত্যি কথাকে সামান্য এদিক-ওদিক করলে কী হয়? সত্যিকে এদিক-ওদিক করলে বিরাট উলট-পালট হয়ে যায়। মিথ্যার বেলায় তা হয় না।

যে কথা বলছিলাম, আমার বাড়িটা হয়ে গেল কান্না বাড়ি। কখনো রূপা কাদছে, কখনো ছোটন কাঁদছে এবং কখনো দেখা যাচ্ছে দু'জনই কাঁদছে। কান্না যখন থামছে তখন হচ্ছে শ্বাসকষ্ট। ইনহেলার হাতে নিয়ে দু'বোন পাশাপাশি বসা। দু'জনই বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। একজনের হাতে ইনহেলার। ইনহেলারটা গাজার কল্কের মতো হাতবদল হচ্ছে। অসম্ভব বিরক্তিকর ব্যাপার।

এই ধারাবাহিক কান্নাকাটির জন্যে আমার একটা ক্ষতিও হয়ে গেল। কাঁসাকন্যা উধাও হয়ে গেল। তার কথাবার্তা শোনা যায় না। তাকে দেখতে পাওয়া তো আরো দূরের ব্যাপার। কাঁসা-কন্যার গলার শব্দ শোনার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা চালালাম। দীর্ঘ সময় ছাদে বই নিয়ে বসে রইলাম। সারাক্ষণ অপেক্ষা করলাম এই বুঝি কাচের চুড়ির টুনটন শব্দ শুনব। কাঁসা-কন্যা বলে উঠবে, এখানে একা একা কী করেন?

কাঁসা-কন্যার সঙ্গে কথা বলার তীব্র বাসনা আমার মধ্যে তৈরি হলো। তাকে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। তার মধ্যে একটি হলো–সাথীর মৃত্যু সে কীভাবে দেখছে? আমি জানি তাকে জিজ্ঞেস করার অর্থ নিজেকেই জিজ্ঞেস করা। সে জবাব যা দেবে তা আমারই জবাব। সেই জবাবও আমার জানা দরকার। আমি কথা বলতে চাই আমার সাব-কনশাস মনের সঙ্গে। সেটা তো এমনিতে সম্ভব না। অবচেতন মনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমার অবশ্যই কাঁসা-কন্যাকে প্রয়োজন। এ বাড়ির কান্না বন্ধ না হলে সে হয়তো আসবে না।

আমি কান্না বন্ধ করার ব্যবস্থা করলাম। দু'বোনের যে-কোনো একজনের কান্না বন্ধ হলে অন্যজনেরটা বন্ধ হবে। আমি বেছে নিলাম ছোটনকে। ঠিক করলাম তাকে ছোটখাটো

একটা শক দেয়া হবে। তার মন’ নামক বিষয়টাকে নাড়া দেয়া হবে। এমন এক ধরনের নাড়া যার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত না। সে পুরোপুরি হকচকিয়ে যাবে। মাথা যাবে এলোমেলো হয়ে। আমি এক সন্ধ্যায় তাকে ছাদে ডেকে পাঠালাম।

সে ছাদে উঠে এলো। তার মুখ বিষণ্ণ। চোখ লাল। বোঝাই যাচ্ছে ছাদে উঠে আসার আগে আগে সে চোখ মুছেছে।

আমি কোমল গলায় বললাম, কেমন আছ ছোটন?

ভালো আছি।

এটা কি ভালো থাকার নমুনা? চোখে এখনো পানি।

ছোটন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, দুলাভাই, আমি ভালো নেই। আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ছোটন, শোন, আমি নিজেও ভালো নেই। আমারও মরে যেতে ইচ্ছা করছে। আমি প্রায়ই ছাদে উঠে আসি, যাতে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে যেতে পারি। আমার সাহস কম বলে কাজটা করতে পারছি না।

ছোটন খুবই বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার কী হয়েছে?

আমি বললাম, আমার কী হয়েছে আমি তোমাকে বলছি, তার আগে। তোমাকে একটা প্রশ্ন করি–তুমি কি জানো আমি ভয়ঙ্কর একজন মানুষ?

না তো।

আমার যে মাথা খারাপ এটা তুমি জানো না? তোমার আপা তোমাকে কিছু বলে নি?

আপনার মাথা খারাপ এটা বলে নি। আপনি মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করেন এটা বলেছে।

তোমাকে বলে নি সে আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ বলেছে।

কোনো ভালো মানুষকে নিশ্চয়ই কেউ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যায় না?

আপনি সামান্য একসেনট্রিক। আপা অল্পতেই ভয় পায় বলে আপনাকে নিয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে আপনি স্বাভাবিক।

ছোটন, তুমি ভুল করছ। মানুষ হিসেবে আমি মোটেই স্বাভাবিক না। আমার মাথায় অনেক এলোমেলো ব্যাপার আছে যা তুমি বা তোমার আপা কেউই

জানে না।

[ভাই, লক্ষ করছেন যে আমি সত্যি কথা বলছি। এই সত্যের মাঝে ছোট ছোট মিথ্যা ঢুকাব। সত্য হলো স্বর্ণ আর মিথ্যা হলো খাদ। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মেশানোয় সত্য হবে

কঠিন এবং ঝলমলে। আমি যে ছোটনকে নাড়া দিতে শুরু করেছি–এটা বুঝতে পারছেন? ছোটনের মুখ থেকে কিন্তু কান্না সম্পূর্ণ চলে গেছে। এখন তাকে আমি বড় শকটা দেব।]

ছোটন শোন, কারো শরীরে যদি দগদগে ঘা হয় সে কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করে ঘা লুকিয়ে রাখতে। মনের অসুখ বিষাক্ত ঘায়ের মতো। মানুষ এই বিষাক্ত ঘা। কাউকে দেখিয়ে বেড়ায় না। লুকিয়ে রাখে।

আপনি এত নিশ্চিত হলেন কীভাবে যে আপনার সত্যি সত্যি মনের অসুখ আছে?

তোমরা দু'বোন এ বাড়িতে উঠে আসার পর থেকে আমার তীব্র ইচ্ছা হচ্ছে তোমার রূপা আপাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে। তখনি বুঝেছি আমার অসুখটা মারাত্মক পর্যায়ের।

আপনি এসব কী বলছেন?

[বড় শকটা দিলাম। এরচে'ও বড় শক আছে। সেটা এখনি দেয়া হবে। প্রথম শকটা সামলানোর আগেই দেয়া হবে। কামারের দোকানে কামারকে লোহার কাজ করতে দেখেছেন? কামার কী করে, আগুনে পুড়িয়ে লোহাকে টকটকে লাল করে। তারপর সেই লোহাকে বাঁকায়। আমিও তাই করছি। বড় শকটা দিয়ে লোহা গনগনে করেছি। এখন আরেকটা শক দিয়ে লোহা বাঁকানো হবে। Ready get set go...]

ছোটন শোন, মন দিয়ে শোন, আমি এখন যা বলব তা শুনলে তুমি আমাকে ভয়ঙ্কর খারাপ ভাববে। তোমার কাছে মনে হবে আমার চেয়ে খারাপ মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি। তুমি

যা ইচ্ছা ভাব। আমাকে আমার কথা বলতেই হবে। যে-কোনো কারণেই হোক তুমি এ বাড়িতে উঠে আসার পর আমার মনে হলো আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

দুলাভাই, আপনি এসব কী বলছেন?

কথা বলবে না। প্লিজ! আমি আগে কী বলছি মন দিয়ে শোন, তারপর চিক্কার চেঁচামেচি যা ইচ্ছা কর। যখন মনে হলো তোমাকে ছাড়া বাঁচব না–তখনি মাথায় এলো তাহলে গলা টিপে রূপাকে খুন করে ফেলি। ছোটন, এখন কি বুঝতে পারছ যে আমার মাথা খারাপ?

বুঝতে পারছি। আমি আপনার পায়ে পড়ি, আপনি এইসব কিছুই আপাকে জানাবেন না। আপা জানতে পারলে খুব কষ্ট পাবে। কষ্টেই সে মরে যাবে।

বলো আমি কী করব? আমি কি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ব? ছোটন, তুমি আমার কাজটা সহজ করে দাও। আমি রেলিং-এর উপর দাঁড়াচ্ছি। তুমি ধাক্কা দিয়ে আমাকে নিচে ফেলে দাও। আমার পক্ষে নিজে নিজে লাফ দেয়া সম্ভব না। পাগলরা সাহসী হয়। কিন্তু আমি সাহসী না। আমি ভীতু।

বলতে বলতে আমি টলোমলো ভঙ্গিতে রেলিং-এ উঠে দাঁড়ালাম। ছোটন। আতঙ্কিত গলায় বলল, দুলাভাই, আপনি নামুন। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি। নামুন।

তুমি যদি আমার প্রতি সামান্য দয়া কর তাহলে নামব।

আপনি আগে নামুন। প্লিজ প্লিজ!

আমি নামলাম। নেমেই গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলাম—

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।

ছোটন ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের এই অশ্রুর ধরন অন্য।

নিজের অভিনয় প্রতিভায় আমি নিজেই চমকৃত হলাম। মনে হলো শেক্সপিয়রের নাটকে একই সঙ্গে দুটি চরিত্রে অভিনয় করছি, Hamlet এবং Ghost.

Hamlet : Alas poor Ghost.

Ghost : Pity me not, but lend thy serious hearing to what I shall unfold.

Hamlet : Speak, I am boond to hear.

Ghost : So art thou to revenge.

একটি তরুণী মেয়ে যদি হঠাৎ কোনো ছেলেকে এসে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। তখন ছেলেটির মানসিক অবস্থা কী হয়? সে আনন্দে আত্মহারা হয়। কিছুক্ষণ সে থাকে On the top of the world. তারপর সে চারদিকে এই গল্প ছড়িয়ে দেয়। পরিচিত অপরিচিত সবাই এই গল্প কয়েকবার শুনে ফেলে। যারা আশেপাশে থাকে না তাদেরকে চিঠি লিখে জানানো হয়–তুমি শুনে খুবই আশ্চর্য হবে, লিলি নামের অত্যন্ত রূপবতী এক তরুণী গত বৃহস্পতিবার বিকাল চারটা পঁচিশ মিনিটে হঠাৎ

করে...। যুবকটি এই গল্প যতই ছড়াতে থাকে ততই তার আবেগ কমতে থাকে। ঘটনার নভেলটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। সে তখন অপেক্ষা করতে থাকে কখন অন্য কোনো তরুণী তাকে এসে এ জাতীয় কথা বলবে।

মেয়েদের বেলায় এই ব্যাপারটি একেবারেই ঘটে না। কোনো তরুণীকে যদি কোনো যুবক এসে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তখন তরুণী আনন্দে আত্মহারা হয় না, বরং খানিকটা ভীত হয়ে পড়ে। সে এই ঘটনা কাউকেই জানায় না। যে কারণে ঘটনাটা তার নিজের মনের ভেতরে বড় হতে থাকে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করে পুরো বিষয়টা মাথা থেকে মুছে ফেলতে। যতই সে চেষ্টা করে ততই এই ঘটনা শিকড় গজিয়ে বসতে থাকে। এক সময় তরুণীটির মনে হয়–আহারে বেচারা! সত্যি বোধহয় সে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। এক সময় সে 'আহারে বেচারা'কে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। দু'জন এক সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছে। ছেলেটা তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। সে বিরক্ত হয়ে বলল, সবসময় তুমি আমার দিকে তাকিয়ে থাক কেন? লোকে কী ভাববে। ছেলেটা গাঢ় স্বরে বলল, ভাবুক যার যা ইচ্ছা। এই বলে সে আগের মতোই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকতে লাগল।

ভাই, বলুন তো আমার এনালাইসিস ঠিক আছে না? এনালাইসিসটা অবশ্যই অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। তারপরেও মনে হয় ঠিক আছে। যদি এনালাইসিস ঠিক হয় তাহলে অবশ্যই ছোটন মেয়েটি আমাকে নিয়ে নানান চিন্তাভাবনা শুরু করবে। চিন্তাভাবনা পানির মতো। যে পানি খাল দিয়ে প্রবাহিত। কোন দিকে প্রবাহিত হবে তা নির্ভর করবে খালটা কোন দিকে কাটা হবে। খাল অবশ্যই ছোটন নিজেই কাটবে, তবে আমাকে সাহায্য করতে

হবে। সাহায্য করা মানে। খাল কাটা নিয়ন্ত্রণ করা। আমি আগ্রহ নিয়েই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নামলাম।

পরের দিনের কথা। দু'বোন ঝিম ধরে বারান্দায় বসে আছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে ছোটনের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললাম, তোমরা দু'জন সবসময় দেখি মূর্তির মতো বসে থাক। এটা তো ঠিক না। কাজকর্ম শুরু কর। কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাক। ছোটন, তোমার কলেজ নেই?

ছোটন মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, আছে। যাব না।

সে সম্ভবত আমার চোখের দিকে তাকাতেই ভয় পাচ্ছিল। আমি বললাম, কলেজ আছে কিন্তু যাবে না তা কেন হবে? ডাক্তারি পড়াটা তো এমন না যে ঘরে বসে পড়ে পুষিয়ে নেবে। তুমি অবশ্যই যাবে। চল, আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।

রূপা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। চল, আমরা দুজন মিলে ওকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে আসি।

আমি বললাম, তোমরা দু'বোন সবসময় এক সঙ্গে ট্যাগ হয়ে থাকবে এটা কেমন কথা? তোমার যাবার কোনো দরকার নেই। তুমি থাক। আমি নামিয়ে। দিয়ে আসছি।

রূপা বলল, ঠিক আছে এটাই ভালো। তুমিই নামিয়ে দিয়ে আস।

ছোটন ভীত গলায় বলল, না আপা, না। আমি যাব না।

রূপা বলল, তুই অবশ্যই যাবি।

আমি ছোটনকে কলেজে নামিয়ে দিতে গেলাম। আমার অতিরিক্ত আগ্রহের কারণে ছোটন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমি নিশ্চিত সে কলেজে যাবার পথে আমি তার সঙ্গে কী আচরণ করব তা নিয়েই তার দুশ্চিন্তা। কী করবে মানুষটা? চট করে হাত ধরে ফেলবে? তার দিকে ঘেঁসে আসবে? গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসার চেষ্টা করতে করতে গদগদ গলায় প্রেমের কথা বলার চেষ্টা করবে?

ছোটন যা ভাবছে সে-রকম কোনো কিছুই করা যাবে না। উদ্ভট কিছু করা যাবে না। মেয়েরা প্রেমিকের উদ্ভট আচরণ পছন্দ করে। অন্যদের কাছ থেকে উদ্ভট আচরণ আশাও করে না, পছন্দও করে না।

আমি গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসলাম। পেছনের সিটে ছোটনের সঙ্গে বসলাম না। গাড়িতে সারা পথে একটি কথাও বললাম না, একবারও পেছন ফিরে তাকালাম না। ছোটন গাড়ি থেকে নেমে আমার জানালার পাশে ঝুঁকে এসে ভয়। পাওয়া গলায় বলল, আমি যাই।

আমি ছোটনের দিকে না তাকিয়ে বললাম, আমি বুঝতে পারছি আমার অদ্ভুত কথাবার্তায় তোমার খুব মন খারাপ হয়েছে। তোমার চেয়ে একশ' গুণ মন। খারাপ হয়েছে আমার। তুমি কিছু মনে করো না। আমি ঠিক করেছি, যে অপরাধ করেছি তার জন্যে আমি নিজেকে শাস্তি দেব।

ছোটন বলল, কী শাস্তি?

আমি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, সেটা তোমার জানার দরকার নেই।

ছোটনকে দেখে মনে হলো সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। তবে আমি জানি এই স্বস্তি সাময়িক। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মধ্যে জন্ম নেবে হতাশা। এবং দুঃখবোধ। কী রকম দুঃখবোধ–ব্যাখ্যা করি? মনে করুন সাত-আট বছরের একটি শিশু হঠাৎ রাস্তায় তার খুব পছন্দের খেলনা কুড়িয়ে পেয়েছে। খেলনাটা হাতে নিতে তার খুব ইচ্ছা করছে কিন্তু সাহস করে নিতে পারছে না। অন্যের খেলনা কেন সে নেবে? তারপরে সে ঠিক করল সে খেলনাটা বাড়িতে নিয়ে যাবে না, শুধু হাতে নিয়ে একটু দেখবে। এই ভেবে যেই সে খেলনার দিকে তাকাল সে দেখল খেলনাটা নেই। এরকম কিছু যদি ঘটে তাহলে শিশুটির মনে যে দুঃখবোধ তৈরি হবে, ছোটনের মনেও ঠিক এরকম দুঃখবোধই তৈরি হয়েছে। আমি সেই দুঃখবোধকে ব্যবহার করে এগুব।

কেন এরকম করছি?

আমি এক ধরনের খেলা খেলছি। খেলার মধ্যে সবচে' আনন্দময় খেলা হলো মনের খেলা। এই খেলা সবাই খেলতে পারে না। কেউ কেউ পারে। যারা পারে। তারা এই খেলা খেলে খুব আনন্দ পায়। আমি পারি।

সে-রাতে আমরা তিনজন খেতে বসেছি। আমি প্লেটে ভাত নিলাম। ইলিশ মাছ ভাজার প্লেটটা কাছে টেনেই হাত গুটিয়ে নিয়ে বললাম, আমি খাব না।

রূপা বলল, কেন, ক্ষিধে হয় নি?

আমি বললাম, ক্ষিধে হয়েছে। কিন্তু আমি খাব না। না খেয়ে নিজেকে কষ্ট দেব।

ছোটন চমকে আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, নিজেকে কষ্ট দেবে কেন?

আমি বললাম, আমি পাপ করেছি। পাপের শাস্তি দেয়ার কেউ নেই। আমাকেই শাস্তিটা দিতে হবে।

রূপা বলল, কী পাপ করেছ?

আমি বললাম, সেটা তোমার জানার দরকার নেই।

পরের দু'দিন এবং দুই রাত্রি সর্বমোট আটচল্লিশ ঘণ্টা আমি পানি ছাড়া কিছুই খেলাম না। রূপা এবং ছোটন হতভম্ব হয়ে গেল। আটচল্লিশ ঘণ্টা পার। হবার পর ছোটনের সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হলো। ছোটন এসে বলল, দুলাভাই, আপনি যদি অনশন ভঙ্গ করেন তাহলে আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব। আমার নিজের স্বার্থে আমি এটা বলছি না। আপার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছি। আপনি লক্ষ করছেন না যে আপা পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে। সে কিছুই। খেতে পারছে না। যা খাচ্ছে বমি করে দিচ্ছে। সে যে আপনাকে কতটা ভালোবাসে তা আপনি জানেন না। কারণ অন্যের ভালোবাসা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। আপার একটা ডায়েরি আছে। ডায়েরিটা পড়ে দেখবেন।

আমি ছোটনের কথা থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, আমি অনশন ভঙ্গ করলে তুমি আমার যে-কোনো কথা শুনবে?

হ্যাঁ।

অন্যায় কথাও শুনবে?

হ্যাঁ।

ভয়ঙ্কর অন্যায় কথাও শুনবে?

হ্যাঁ।

বেশ, রাতে তোমাদের দু'বোনের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসব। রাতের খাওয়া শেষ হবার পর আমি জর্দা দিয়ে একটা পান খাব। একটা সিগারেট ধরাব–তারপর কথাটা বলব। ঠিক আছে?

ছোটন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ঠিক আছে।

আমি বললাম, মনে রেখো, তুমি কিন্তু বলেছ আমার ভয়ঙ্কর অন্যায় আবদারও তুমি রাখবে।

ছোটন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। পাথরের মূর্তির সঙ্গে তার একটাই তফাত–পাথরের মূর্তির ঠোট কাঁপে না, ছোটনের ঠোট কাপছে। ছোটনের মনে হয় শ্বাসকষ্টও হচ্ছে। সে হা

করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি তার সমস্ত চিন্তা চেতনায় আছে–ভয়ঙ্কর অন্যায় চাওয়াটা কী হতে পারে?

আমি বললাম, ছোটন, দাঁড়িয়ে আছ কেন? রাতের খাবারের আয়োজন কর। খাবারটা যেন ভালো হয়। তোমার কি দুশ্চিন্তা লাগছে?

সে জবাব দিল না।

আমি বললাম, আজ রাতে যখন খেতে বসবে, সুন্দর করে সেজে খেতে বসবে। শাড়ি পরবে। কপালে টিপ দেবে। চুল বাঁধবে।

কেন?

তুমি এমনিতেই খুবই রূপবতী। সাজলে তোমার রূপ বাড়ে না কমে এটা দেখার ইচ্ছা। খুব রূপবতীরা সাজতে পারে না। সাজলে তাদের ভালো দেখায় না।

ছোটন শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। আমার সামনে থেকে চলে গেল না। দাড়িয়েই রইল।

রাতে খেতে বসেছি। ছোটন শাড়ি পরেছে, কপালে টিপ দিয়েছে, চুল বেঁধেছে। রূপা বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, কী হয়েছে?

ছোটন বলল, কিছু হয় নি তো।

রূপা বলল, এমন সাজগোজ করেছিস কেন?

ছোটন বলল, এমনি।

রূপা বলল, ঠিক করে বল তো ছোটন, তোর কি কোনো সমস্যা হয়েছে? কয়েকদিন ধরে লক্ষ করছি তোর আচার-আচরণ যেন কেমন কেমন।

ছোটন বলল, আমার কিছু হয় নি।

রূপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে না ওর আচার-আচরণ অস্বাভাবিক?

আমি বললাম, মনে হচ্ছে।

রূপা বলল, কী মনে হচ্ছে বলো তো?

মনে হচ্ছে ও একটা ঘোরের মধ্যে আছে। প্রবল ঘোর। কোনো মেয়ে যদি প্রথম কারো প্রেমে পড়ে তাহলে তার মধ্যে এমন ঘোর তৈরি হয়। তার মধ্যে শশক-প্রবৃত্তি চলে আসে।

কী প্রবৃত্তি?

শশক-প্রবৃত্তি।

সেটা আবার কী?

শশক হলো খরগোশ। খরগোশ কী করে দেখ না? কিছুক্ষণ চুপচাপ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। নড়বে না। প্রায় পাথরের মূর্তি। তারপর হঠাৎ ছুটে কিছুদূর গিয়ে আবার মূর্তির মতো হয়ে যাবে। প্রথম প্রেমের সময় মেয়েরা এরকম করে।

ছোটন হঠাৎ হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। আমি বললাম, তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছিলে?

ছোটন বলল, এখন বলতে চাচ্ছি না।

রূপা বলল, তোর কিছু বলার থাকলে বল। ঝিম ধরে থাকবি না। তোর এই খরগোশের মতো ঝিম ধরে থাকাটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

আমি বললাম, ছোটনের মনে একটা প্রশ্ন এসেছিল। প্রশ্নটা সে করত। হঠাৎ মনে হলো– প্রশ্নটা এমন কিছু জরুরি না। না করলে কিছু যায় আসে না। তাই না ছোটন?

হ্যাঁ।

তোমার প্রশ্নটা আমি জানি। উত্তর দেব?

ছোটন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। রূপা বলল, ওর মাথায় কী প্রশ্ন তুমি জানবে কী করে? তুমি তো থট রিডিং জানো না।

আমি বললাম, থট রিডিং জানব না কেন? কিছু তো অবশ্যই জানি। প্রকৃতি সমস্ত প্রাণীজগতকে থট রিডিং-এর ক্ষমতা দিয়েছে।

রূপা বলল, ছোটন কী প্রশ্ন করতে চাচ্ছিল যদি জানো তাহলে উত্তর দাও। ওর ভাবভঙ্গি আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

আমি বললাম, ছোটনের প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রেমে পড়ার সময় মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় শশক-প্রবৃত্তি। ছেলেদের মধ্যে কী দেখা যায়? ছোটন, এটাই তো তোমার প্রশ্ন? ঠিক ধরেছি না?

ছোটন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, প্রথম প্রেমে পড়লে ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় বানর-প্রবৃত্তি। বানর যেমন অকারণে লাফ ঝাপ দিয়ে ডিগবাজি খায়, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালায়, প্রথম প্রেমে পড়া পুরুষের ক্ষেত্রে তাই হয়। লাফ ঝাপ ডিগবাজি। সবাইকে জানানো–দেখ আমি প্রেমে পড়েছি।

রূপা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মনে হচ্ছে সেও কিছু বলতে চাচ্ছে। সে কিছু বলল না। ছোটনের প্লেটে ইলিশ মাছ তুলে দিল।

ছোটন বোনের দিকে একবার তাকিয়ে খাওয়া বন্ধ করে উঠে চলে গেল।

রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, ওর কী হয়েছে?

আমি নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম। হাত ধুতে ধুতে রূপাকে বললাম, আমি কিছুক্ষণ ছাদে শুয়ে থাকব। তারা দেখব। ছোটনকে দিয়ে আমার কাছে এক কাপ চা পাঠিও। ওকে নিরিবিলিতে জিজ্ঞেস করব ওর কী হয়েছে?

আমি ছাদে পাটি পেতে শুয়ে আছি। আকাশে তারা আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। প্রশ্নবোধক চিহ্নের এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছে। যেন কেউ একজন তার প্রশ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশের গায়ে।

দুলাভাই, চা নিন।

ছোটন চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এক দৃষ্টিতে আকাশ দেখছিলাম বলেই বোধহয় তাকে লক্ষ করি নি। আমি বললাম, কেমন আছ ছোটন?

সে যন্ত্রের মতো বলল, ভালো। এখন বলুন আপনি আমার কাছে কী চান? আমাকে কী করতে হবে?

আমি চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললাম, তোমাকে যা করতে হবে তা হলো সবসময় সুন্দর করে সেজেগুজে থাকতে হবে। হাসতে হবে। দরজা বন্ধ করে কান্নাকাটি করা চলবে না।

এই আপনার চাওয়া?

হ্যাঁ, এই আমার চাওয়া।

এটাকে আপনি কেন বলছেন ভয়ঙ্কর অন্যায় চাওয়া?

তুমি দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ। পরিবারের দু'জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে, এর মধ্যে আমি তোমাকে বলছি হাসিখুশি থাকতে, সেজেগুজে থাকতে এটা অন্যায় না? এই চাওয়া কি ভয়ঙ্কর চাওয়া না?

ছোটন বলল, এখন কি আমি চলে যাব?

হ্যাঁ, যাও।

তারপরেও ছোটন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আমি যখন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আবারো আকাশ দেখতে থাকলাম তখন তার পায়ের শব্দ শুনলাম। সে চলে যাচ্ছে। পায়ের শব্দেই বলে দিতে পারছি সে এলোমেলো ভঙ্গিতে পা ফেলছে।

আপনি কি বুঝতে পারছেন ছোটন মেয়েটি এই ঘটনার পর আমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকবে? একবার ডুববে আবার ভাসবে। আবার ডুববে। শুরু হবে ভাসা ডুবার খেলা। নানান জটিলতা তৈরি হবে তার মনে। ত্রিমুখি জটিলতা। একদিকে তার দু'কুল ভাসানো প্রেম। অন্য আরেক দিকে তার অতি আদরের বোন রূপা, রূপার সংসার। তৃতীয় দিকে তার মৃতা বড় বোন এবং পিতা। ত্রিমুখি টানাটানির যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তির পথ খুঁজবে। মুক্তির পথও কিন্তু আমি দেখিয়ে দিয়েছি। নিজে রেলিং-এ দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেয়ার কথা

বলেছি। সেই স্মৃতি অবশ্যই ছোটনের মাথায় ঢুকে গেছে। সেই স্মৃতি ডুব দিয়ে আছে মস্তিষ্কের সাব-কনসাস লেভেলের নিচে। যথাসময়ে সেই স্মৃতি বের হয়ে আসবে। যাতে বের হয়ে আসে, সূক্ষ্মভাবে সেই চেষ্টা আমি করব। আমাকেও এগুতে হবে সাবধানে। ডমিনো প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। টোকা দিলে সেই প্রাসাদ ভেঙে পড়বে। কোন দিকে ভাঙবে তা নির্ভর করবে টোকাটা কোথায় দেয়া হবে তার উপর।

অনেকদিন পর সেই রাতে কাঁসা-কন্যার দেখা পেলাম। আমি আকাশের তারা দেখছি, সে মিষ্টি গলায় বলল, কী দেখছেন?

আমি বললাম, তারা দেখছি।

সে হাসল। আমি বললাম, হাসছ কেন?

কাঁসা-কন্যা বলল, ছোটন বেচারির আশাভঙ্গ দেখে মজা পেয়ে হাসছি। বেচারি ভয়ঙ্কর কিছু আশা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান আছে না? 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।'

গানটা কি তুমি জানো?

কেন জানব না! আমি পৃথিবীর সব গান জানি, সব সুর জানি।

বেশ, তাহলে গানটা শোনাও।

এটা না, অন্য একটা গান শোনাই। তুমি তারা দেখতে থাক, আমি গান গাইতে থাকি।

আমাকে তুমি আপনি করে বলতে; আজ হঠাৎ ‘তুমি করে বলছ কেন?

আমরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি তো, এই জন্যে তুমি করে বলছি। আরো যখন কাছাকাছি আসব তখন তুমিও বলব না। কিছুই বলব না।

আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ কি আছে?

অবশ্যই আছে। যখন কেউ থাকবে না, যখন শুধু তুমি আর আমি থাকব তখন...।

রূপা কোথায় যাবে?

কাঁসা-কন্যা বলল, এত কথা বলতে ভালো লাগছে না। এখন গান শোনো।

কাঁসা-কন্যা গান শুরু করল। আহারে কী মধুর কিন্নর কণ্ঠ! আমি তাকিয়ে আছি, গান হচ্ছে। আকাশের তারারা ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে। তাদের আলো নরম হয়ে চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। কাঁসা-কন্যা গাইছে—

বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে!
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,

ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে–
জন-জনম গেল বিরহশোকে।

জন্ম-জনম গেল বিরহ শোকে লক্ষ করেছেন কি সুন্দর লাইন? জন্ম গেল, আবার জনমও গেল। তিনি লিখতে পারতেন–জনম জনম গেল বিরহশোকে। সেটাও কম সুন্দর হতো না। কাজী নজরুল লিখেছেন–জনম জনম তব তরে কাদিব।' এত সুন্দর লাইন মানুষের মাথায় আসে কী করে? মানুষ হলো অস্বাভাবিক ক্ষমতাধর এক প্রাণী। সে পারে না এমন কিছু কি আছে? তার চিন্তা এবং কল্পনার বাইরে কি কিছু আছে? পেটেন্ট অফিসের সামান্য একজন কেরানি মাথা চুলকাতে চুলকাতে হঠাৎ একদিন বলে বসলেন–আলোর গতি বিষয়টা তো গোলমেলে। গোলমালটা ঠিক করা দরকার। বের হয়ে গেল আপেক্ষিক তত্ত্ব। মানব সভ্যতা একদিনে হাজার বছর এগিয়ে গেল।

আমরা খুবই এলোমেলো পৃথিবীতে বাস করি। এলোমেলো ব্যাপারটা ঠিক করতে করতে এগিয়ে যাই। একটু এগুতেই আবার পঁাচ লেগে যায়। আমি ভয়ঙ্কর এলোমেলো এক জগতে বাস করছি। ঠিক করতে পারছি না। কাঁসা-কন্যা কি পারবে? তাকে জিজ্ঞেস করব?

না থাক, বেচারি দরদ দিয়ে গান করছে। তার চোখে অশ্রু টলমল করছে। গানের কোন লাইনে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে এটা দেখা দরকার। আমি কাঁসাকন্যার চোখের জল এবং গানের লাইন লক্ষ করছি। দু'টি পর্যবেক্ষণ কি একই সঙ্গে সম্ভব? হাইজেনবার্গের Uncertainity principle কী বলে? অবশ্যি অনিশ্চয়তার এই সূত্র Macro বস্তুজগতে কাজ করে না। কাঁসা-কন্যা কি Macro বস্তু?

৬. আপনি কি শুশুক দেখেছেন

আপনি কি শুশুক দেখেছেন? কেউ কেউ বলে শিশু। দেখেছেন শিশু? নৌকায়। যাচ্ছেন, ভুস করে নদীর পানিতে কিছু একটা ভেসে উঠেই ডুবে গেল। অবশ্যই দেখেছেন। এই শুশুক যে ডলফিনের প্রজাতি তা কি জানেন?

জানেন না?

শুশুক হলো ডলফিনের একটা প্রজাতি। এই প্রজাতি জন্মান্ধ। এর জন্মান্ধ হবার পেছনের কারণটা জানেন? শুশুক থাকে নদীতে। এদেশের নদীর পানি প্রচণ্ড ঘোলা। এই পানিতে যে বাস করে সে কিছু দেখতে পায় না। কাজেই তার চোখ থাকা না-থাকা একই। প্রকৃতি তখন কী করল–শুশুকের চোখ বাতিল করে দিল। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? উইপোকার মতো আরেকটি অন্ধ প্রজাতি জন্ম নিল। উইপোকা যে জন্মান্ধ তা জানেন না? প্রাণীজগতের অনেক প্রজাতিই জন্মান্ধ।

এখন লজিকে আসুন। মনে করুন আপনাকে নির্জন নির্বাসন দেয়া হয়েছে। আপনাকে খাবার দেয়া হয় ঠিকই কিন্তু কেউ আপনার কাছে আসে না। মানুষ তো দূরের কথা, পশুপাখিও না। মনে করুন কুড়ি বছর এইভাবে কেটে গেল। আপনার ভেতর ভালোবাসার যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তার কোনোরকম ব্যবহার হলো না। তখন প্রকৃতি কী করবে? আপনার ভালোবাসার ক্ষমতা বাতিল করে দেবে না? শুশুকের বেলায় যে-রকম হয়েছিল? বিশ বছর পর আপনি যদি আত্মীয়স্বজনদের কাছে ফিরে যান তখন দেখবেন কারো প্রতি কোনো ভালোবাসা, আকর্ষণ বিকর্ষণ কিছুই বোধ করছেন না।

আমার ক্ষেত্রেও হয়তোবা সে-রকম কিছু ঘটেছে। প্রকৃতি আমার ভেতর থেকে ভালোবাসার ক্ষমতা তুলে নিয়েছে। আনন্দিত হবার দুঃখিত হবার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি শুশুক প্রজাতির মতো অন্ধ হয়ে গিয়েছি।

অর্থাৎ আমার মানসিকতার স্বাভাবিক গঠনের অবনতি ঘটেছে। মানুষের ক্ষেত্রে যে এরকম ঘটবে তার উল্লেখ কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। সূরা ইয়াসিনে আল্লাহপাক বলছেন—'আমান নুআম্মিরহু নুনাক্কিছহু ফিল খালাক।' যার অর্থ হলো, 'আমি যাহাকে জীবনদান করি তাহার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই।' বুঝতে পারছেন কিছু?

আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি কি করি না, এই বিষয় নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না। আমার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সিজিওফ্রেনিক রোগীরা ধর্মবিশ্বাসী হয়। তারা গভীর বিশ্বাসে ধর্মকর্ম করে। কঠিনভাবেই করে। সাইকিয়াট্রিস্টরা যখন কোনো রোগীর সিজিওফ্রেনিয়া হয়েছে। বলে সন্দেহ করেন তখন তার প্রথম প্রশ্নই থাকে–'আপনি কি ধর্মকর্ম করেন? ধর্মের নিয়মকানুন কঠিনভাবে পালন করেন? নিশিরাতে প্রার্থনায় মগ্ন থাকেন?

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে আপনি যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের মনে বিরাট আনন্দ হবে। তিনি মনে মনে বলবেন, 'তরে পাইছি'।

আপনার কি মনে আছে–শুরুতে আপনাকে বলেছিলাম যে, আমি আবারো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাই? রূপার তথাকথিত ভাইয়ের কথা বলছি। প্রথমবার গিয়েছিলাম তার বাসায়, এবার যাই তাঁর চেম্বারে। মজার ব্যাপার হলো তিনি কিন্তু আমাকে চিনতে পারেন না।

একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হচ্ছে সিজিওফ্রেনিকদের স্মৃতিশক্তি খুব ভালো হয়, সাইকিয়াট্রিস্টদের স্মৃতিশক্তি হয় দুর্বল এবং ডেনটিস্টদের আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে সবচে’ বেশি।

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক বললেন, কাইন্ডলি আপনার নামটা বলুন।

আমি নাম না বলে বললাম, স্যার, আমি বিরাট মানসিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমাকে সারিয়ে তুলুন। টাকা-পয়সা যা লাগে দেব। টাকা পয়সা আমার কাছে কোনো ব্যাপার না। আমি একজন ধনবান ব্যক্তি।

ভদ্রলোকের চোখ চকচক করে উঠল। আমাদের দেশে সাইকিয়াট্রিস্টরা রোগী পান না। অন্য ডাক্তাররা যেখানে টাকা গুনতে গুনতে হাতে ঘা করে ফেলেন, সাইকিয়াট্রিস্টদের সেখানে দেখা যায় উড়ন্ত মাছির সাইকোএনালিসিস করে সময় কাটাতে।

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, আপনার সমস্যা কী?

আমার সমস্যা হলো আমি একজন সিজিওফ্রেনিয়ার রোগী।

আপনি কিসের রোগী সেটা আমি ঠিক করব। আপনার কী করে ধারণা হলো যে আপনি সিজিওফ্রেনিয়ার রোগী? যে রোগী সে কি তার রোগ বুঝতে পারে?

আমি বললাম, কেন পারবে না? আমার যদি রোজ কাপুনি দিয়ে জ্বর আসে, প্লীহা বড় হয় তাহলে আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে।

সিজিওফ্রেনিয়া চোখ বন্ধ করে ডায়াগনোসিস করার রোগ না। আপনি দয়া করে অল্প কথায় আপনার সমস্যাগুলি বলুন।

অল্প কথায় বলব?

হ্যাঁ, অল্প কথায় বলুন। আপনি কি একা এসেছেন? সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসেন নি? মানসিক রোগীরা কখনো নিজের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না।

স্যার, আমি ইচ্ছা করেই কাউকে আনি নি। কারণ আমি এমনসব কথা আপনাকে বলব যা তৃতীয় কোনো মানুষের শোনা উচিত না। স্যার, আমি কি শুরু করব?

হ্যাঁ, শুরু করুন।

অল্প কথায়?

হ্যাঁ, অল্প কথায়। প্লিজ।

আমি মজার গল্প বলছি এমন ভঙ্গিতে শুরু করলাম আমাদের বাড়িতে একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আমার স্ত্রীর বড়বোন মারা গেছেন এবং সবচে' ছোট বোনটিও মারা যাবে মারা যাবে করছে। বড়বোন মারা গেছেন ভূতের ভয়ে। ছোটটি খুব সম্ভব মারা যাবে পিচ্ছিল ছাদ থেকে পিছলে উঠানে পড়ে। তৃতীয় মৃত্যু অর্থাৎ আমার স্ত্রীর মৃত্যুও অতি শিগগির ঘটবে, এই নিয়ে আমি চিন্তিত। আপনাদের সাইকিয়াট্রিস্টের ভাষায় এই মানসিক

অবস্থাটির নাম হয়তো প্যারনয়া। কল্পিত বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হওয়া। একের পর এক সবাই মারা যাচ্ছে–এরকম টেনশনের শিকার হওয়া।

কিছু মনে করবেন না, আপনি কি আমার কাছে আগে কখনো এসেছিলেন? আপনি কি সেই ব্যক্তি যে সারারাত টেলিফোন করে আমাকে জ্বালাতন করেছে?

আমি খুব বিস্মিত হয়েছি এরকম ভঙ্গি করে বললাম, আপনি ধরে ফেলেছেন। স্যার! জি এসেছিলাম। আমার স্ত্রী রূপাকে নিয়ে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। স্যার, আপনার তো অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। আমি মুগ্ধ! সাইকিয়াট্রিস্টদের ভেতর এমন স্মৃতিধর মানুষ দেখা যায় না। আগের আমল হলে আপনার পায়ের ধুলা নিতাম। এই আমলে যে পায়ের ধুলা নেয় সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখে।

ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি গভীর সন্দেহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার উপর খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। আমি কি চলে যাব? না-কি অতি সংক্ষেপে আমার সমস্যাটা আপনাকে জানাব।

আপনার সমস্যাটা কী?

আমি ডাক্তারের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে গলার স্বর নামিয়ে বললাম, আমি স্যার দু'জন স্ত্রীর সঙ্গে সংসার কাটাচ্ছি। একজনের নাম তো আপনাকে আগেই বলেছি, তার নাম রূপা; আরেকজনের নাম কাঁসা। একটা হলো নোবেল। মেটাল, অন্যটা শংকর ধাতু।

ডাক্তার আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন।

আমি আহত গলায় বললাম, সময় নষ্ট করছি?

অবশ্যই সময় নষ্ট করছেন। এখন আপনার কথা আমার পুরোপুরি মনে। পড়েছে। আপনি মনগড়া সব স্বপ্নের কথা বলে প্রথম দিন আমাকে চূড়ান্ত রকমের বিরক্ত করেছিলেন। আবারো বিরক্ত করতে এসেছেন।

স্যার, আমি কি চলে যাব?

অবশ্যই চলে যাবেন।

আপনার ফিস দিতে হবে না?

না, দিতে হবে না।

পাঁচশ’ টাকার একটা নোট দিয়ে যাই? আপনার সময় নষ্ট করেছি। সময়ের মূল্য।

দয়া করে আপনি উঠুন। আমাকে রোগী দেখতে হবে।

স্যার, আমি তো একজন রোগী। মানসিক রোগী।

আপনি রোগী না। আপনি মানসিকভাবে অতি সুস্থ একজন মানুষ।

চট করে এরকম সিদ্ধান্তে কী করে এলেন জানতে পারি?

মানসিক রোগীরা আর যাই পারুক রসিকতা করতে পারে না। হিউমার বোঝার এবং করার ক্ষমতাটা তাদের প্রথমেই নষ্ট হয়। আপনার সেই ক্ষমতা পুরোপুরি আছে।

এমন কি হতে পারে না স্যার–আমার যে সিজিওফ্রেনিয়া হয়েছে সেটা ভিন্ন। প্রজাতির? শুশুক যেমন ডলফিনেরই একটি প্রজাতি। ডলফিনের চোখ আছে। শুশুক জন্মান্ধ। হয়তো আমার হয়েছে শুশুকটাইপ সিজিওফ্রেনিয়া।

কেন বিরক্ত করছেন?

স্যার, মাঝে মাঝে মানুষকে বিরক্ত করতে আমার খুব ভালো লাগে। মাছি হতে ইচ্ছা করে।

তার মানে?

মানুষকে সবচে' বিরক্ত করতে পারে মাছি। সেই জন্যেই মাছি হতে চাই। মাছি হয়ে সবাইকে বিরক্ত করে মারব।

আপনি কি দয়া করে উঠবেন? প্লিজ।

আমি উঠলাম। এ দেশের একজন বড় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছ থেকে Clean bill of mental health নিয়ে বাড়িতে চলে এলাম।

আমার আনন্দ হচ্ছে। আমার মনে কোনো রোগ নেই–এই ভেবে আনন্দ না। ডাক্তার আমার রোগ ধরতে পারছেন না–এই ভেবে আনন্দ। মানসিক অসুখ সম্ভবত একমাত্র অসুখ যে অসুখ ডাক্তাররা ধরতে না পারলে খুব আনন্দ হয়।

আমি ডাক্তার হলে ভালো করতে পারতাম। আধি ডাক্তারের কথা বলছি। মন-বিশেষজ্ঞ। রোগীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই চট করে বলে দিতে পারতাম রোগীর কী হয়েছে। Silence of the lambs ছবিটা দেখেছেন? ডা. হানিবলের কথা মনে আছে?

না না, নিজেকে আমার কখনো ডা. হানিবল মনে হয় না। আমি নিজেকে বুদ্ধিমান এবং মজার একজন মানুষ বলে মনে করি। যে মানুষটির চিন্তা করার ক্ষমতা ভালো। সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষমতাও ভালো এবং লোকচরিত্র সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে। যে মানুষটা জানে দুই-এর সঙ্গে দুই মিলালে কখন চার হয়, কখন বাইশ হয়।

আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অহঙ্কারী ভাবছেন। আমি অহঙ্কারী না। আমি এমন একজন যার নিজের উপর আস্থা আছে। আস্থা থাকা দোষের কিছু না। বেশিরভাগ মানুষ বিনয় নামক হাস্যকর গুণের জন্যে নিজের উপর আস্থার ব্যাপারটা চেপে যায়। আমার মধ্যে বিনয়ের ছিটেফোঁটা নাই বলে আমি...

কী হাবিজাবি বলছি! মূল বিষয়ে আসি। মূল বিষয় হলো আমি ডা. হানিবলের মতো মনের ডাক্তার হলে ভালো করতাম। আমার মামা শেখ ইফতেখারের অসুখটা যেভাবে ধরলাম–তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই আমার মনে হলো সাথীর মৃত্যু তিনি স্বাভাবিকভাবে নেন নি। সামান্য সন্দেহ তাঁর মনে দানা বেঁধেছে। ইংরেজিতে বললে বলতে হয়–A crystal of suspision has formed. A tiny crystal.

কৃস্টালের সমস্যা হলো একটা দানা তৈরি হওয়া মাত্র আরো দানা তৈরি হতে থাকে, দানা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সময় নেয় প্রথম দানাটি।

ইফতেখার মামা তার স্বভাবমতো সব সমস্যা মিটালেন। ডাক্তারি সার্টিফিকেট জোগাড় করলেন ‘মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশনে রোগীর মৃত্যু। মওলানা ডাকিয়ে জানাজার ব্যবস্থা করলেন। আজিমপুর গোরস্তানে কবরের ব্যবস্থা করে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তখনি বুঝলাম একটা ঝামেলা তো হয়েছে। ইফতেখার মামা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন? আমাকে তিনি নিশ্চয়ই সান্ত্বনা দিতে আসছেন না। তিনি জানেন আমার সান্তনার প্রয়োজন নেই। এই জিনিস আমার লাগে না।

মামা কয়েকবার খুকখুক করে কেশে বললেন, বাবা, কেমন আছ?

আমি জবাব দিলাম না। জবাব দেবার প্রয়োজন নেই। আমি কেমন আছি এই সংবাদ সংগ্রহের জন্যে তিনি আসেন নি। তাঁর খুকখুক কাশির মতো প্রশ্নটাও উদ্দেশ্যহীন। তার চোখ দুটিও উদ্দেশ্যহীন মানুষের চোখের মতোই ছটফট করছে। আমি বললাম, আপনি কেমন আছেন?

তিনি আবারো খুকখুক করে কাশলেন। আমি বললাম, আপনার হাত কি ঠিক আছে? বড় ধরনের কোনো মিথ্যা কথা বলায় হাত অবশ হয়ে যায় নি তো?

তিনি মেঝের দিকে তাকিয়ে না-সূচক মাথা নাড়লেন। আমি বললাম, আপনি কি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে এসেছেন?

ইফতেখার মামা মেঝে থেকে তার দৃষ্টি উপরে তুললেন, তবে আমার দিকে তাকালেন না। আমার পেছনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েটা মারা গেল কীভাবে?

আমি বললাম, ভয় পেয়ে মারা গেছে। কেউ একজন তাকে ভয় দেখিয়েছে। সেই ভয়টা সে নিতে পারে নি। মনে হয় মেয়েটার হার্ট দুর্বল ছিল।

ইফতেখার মামা বললেন, ও আচ্ছা।

আমি বললাম, ভয় দেখানোটা ছিল একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অংশ। হার্টের রিদমে ভয়ের প্রভাব বিষয়ক পরীক্ষা।

মামা আবারো বললেন, ও আচ্ছা।

আমি বললাম, আপনি আর কিছু জানতে চান?

মামার দৃষ্টি আবারো মেঝেতে নিবদ্ধ হলো এবং তিনি না-সূচক মাথা নাড়লেন। তিনি আর কিছু শুনতে চান না। তিনি যা জানতে এসেছিলেন তারচে' বেশি জেনে গেছেন।

আমি বললাম, আপনি যদি আর কিছু শুনতে না চান তাহলে বাসায় চলে যান। বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার শরীর। ভালো না।

ইফতেখার মামা বসেই রইলেন। মামার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার ভালো লাগছে। পুরোপুরি 'Confused state'-এর একজন মানুষ। এটা খুবই বিপদজনক অবস্থা। মানুষ

বেশিক্ষণ কনফিউশান নিতে পারে না। মানব মস্তিষ্ক কনফিউশান থেকে বের হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। যদি সে সফল হয় তাহলে ভালো। যদি সফল না হয় তাহলে মস্তিষ্ক কনফিউশানটাকেই সত্যি ধরে নিয়ে তার জগৎটা অতি দ্রুত সাজিয়ে ফেলে। তার জগৎ তখন হয়ে যায় কনফিউশানের জগৎ। A state of total confusion. A state of wrong reality. সেই অবস্থাটা ভয়াবহ।

আমি মামার দিকে ঝুঁকে এসে বললাম, মামা, বাসায় যান।

তিনি বললেন, আচ্ছা।

কিন্তু তিনি আগের জায়গাতেই বসে রইলেন। খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। মানুষটা কনফিউশান থেকে বের হতে পারছে না। তাঁর মস্তিষ্ক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্ক চেষ্টা যে চালাচ্ছে তা বুঝা যাচ্ছে মামার দ্রুত শ্বাস নেয়া দেখে। তাঁর হার্ট অতি দ্রুত রক্ত পাম্প করছে। গ্যালন গ্যালন রক্ত চলে যাচ্ছে মস্তিষ্কে। অক্সিজেনে ভরপুর ধমনীর বিশুদ্ধ রক্ত। মস্তিষ্ক অতিরিক্ত পরিশ্রম করছে, তার অতিরিক্ত খাদ্য দরকার। তার প্রয়োজন বিশুদ্ধ অক্সিজেন।

৭. জগৎ দুরকমের—বস্তুজগৎ ও মনের জগৎ

জগৎ দু'রকমের।

বস্তুজগৎ। যে জগতে পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলি কার্যকর। যেখানে আলোর গতি নির্দিষ্ট। কখনো এর বেশি হতে পারবে না।

আরেকটি হলো মনের জগৎ (আসলে মস্তিষ্কের জগৎ, মন বাস করে মস্তিষ্কে)। এই জগতে সম্ভবত পদার্থবিদ্যার নিয়মকানুন কার্যকর না। আমি ঢাকায় বসে তৎক্ষণাৎ কল্পনায় নিউইয়র্কে চলে যেতে পারি। আলো যে গতিতে চলে। তারচে অনেক দ্রুত গতিতে যাই। আমরা সময়ের বাধাকে অগ্রাহ্য করতে পারি। টাইম মেশিনের গল্পের মতো অতীতেও যেতে পারি। মধ্যবয়সেও ফিরে যেতে পারি শৈশবে।

তবে দু'টি জগতই পদার্থবিদ্যার Cause and Effect মেনে চলে। প্রথমে Cause তারপর Effect. শুধুমাত্র এই একটি ক্ষেত্রে দুটি জগতের মিল আছে।

ছোটনের মনের জগতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্যে Cause সৃষ্টি করে আমি বসে রইলাম। যথাসময়ে Effect দেখব এই বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম। এখানে Cause-টা ছিল তার ভেতর তীব্র ভালোবাসাবোধ তৈরি করা, আর Effect ছিল তীব্র শূন্যতাবোধ তৈরি করা।

মানুষের মস্তিষ্ক শূন্যতা নিতে পারে না। সে যখন তীব্র শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয় তখনই মুক্তির পথ দেখে। আত্মহনন হলো অনেকগুলি পথের একটি পথ। মোটামুটিভাবে

ঝামেলামুক্ত পথ। দড়িতে কষ্ট করে ঝুলে পড়ে সব কষ্টের শেষ ঘটানো। দড়ি যোগাড় করে সিলিং ফ্যানে ঝুলানোটাই একমাত্র ঝামেলা।

সব ঝামেলা মিটিয়ে আত্মহননের ব্যাপারটা কেউ খুব গুছিয়ে করে, আবার কেউ এলোমেলোভাবে করে।

ছোটন কাজটা খুব গুছিয়ে করেছিল। অনেকেই তাড়াহুড়া করে আমি আত্মহত্যা করছি' এই জাতীয় চিঠিপত্র লেখে না। তখন পুলিশ খুব ঝামেলা করে। ছোটন তা করে নি। সে তার বোনকে সুন্দর চিঠি লিখে গেল। সেই চিঠিতে একবারও আত্মহননের মূল কারণ উল্লেখ করল না। সে লিখল—

রূপা আপু,

তুমি আবার রাগ করো না। আমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না। হয়তো আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। অসুখটা এত জটিল যে এর চিকিৎসা সম্ভব না।

আপু শোন, আমার মৃত্যুতে তুমি তীব্র কষ্ট পাবে তা আমি জানি। দুলাভাইও কষ্ট পাবেন। তোমার কাছে আমার অনুরোধ কষ্ট ভোলার ব্যাপারে তুমি দুলাভাইকে সাহায্য করবে।

তোমাদের দুজনের জীবন যেন অসম্ভব সুন্দর হয়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন আনন্দময় হয়–এই তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভকামনা।

ছোটন

বুধবার, অক্টোবর বার।
(সময় বিকাল পাঁচটা)

চিঠিটা সে লিখল বিকাল পাঁচটায়, তখন আমি রূপাকে নিয়ে ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছি। তার দাঁতে ব্যথা।

সন্ধ্যা ছ'টায় ছোটন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। এই সময়ে ডেনটিস্ট রূপার দাঁত ড্রিলিং মেশিন দিয়ে ড্রিল করছে। রূপা ভয়ে এবং যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। রোমান পলনস্কি এই ঘটনা নিয়ে ছবি বানালে দৃশ্যগুলি হয়তো এরকম করে সাজাতেন—

দৃশ্য এক। ডেনটিস্ট রূপাকে চেয়ারে বসাল।

কাট। দৃশ্য দুই। ছোটন রেলিংয়ের উপর উঠে দাঁড়াল।

কাট। দৃশ্য তিন। ডেনটিস্ট রূপার দাঁত ড্রিল করছে।

কাট। দৃশ্য চার। ছোটন রেলিংয়ের উপর দাড়িয়ে। সামান্য দুলছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে ড্রিলিং মেশিনের শব্দ।

কাট। দৃশ্য পাঁচ। রূপা ব্যথায় চিৎকার করে উঠল।

কাট। দৃশ্য ছয়। ছোটন লাফ দিল।

ভালো কথা, আপনি রোমান পলনস্কির ছবি দেখেছেন? 'রিপালশান' ছবিটা দেখতে পারেন। এই প্রতিভাবান মানুষটা যে তের বছর বয়েসী এক বালিকাকে রেপ করেছিল এটা জানেন? রেপিস্ট মাত্রই মানসিক রোগী। তবে প্রতিভাবানরা না। তাই না?

আপনি কি কখনো সাগরে স্নান করেছেন? প্রথম একটা বড় ঢেউ আপনার উপর দিয়ে গেল। আপনি ভয়ে এবং আতঙ্কে অস্থির হলেন। দ্বিতীয় বড় ঢেউটা যখন গেল তখন ভয় অনেক কম। আতঙ্কও কম। অস্থিরতা নেই বললেই হয়। বরং কিছুটা আনন্দ লাগছে।

পরপর দুটি বিপর্যয়কে সমুদ্রের বড় দু'টা ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রথম বিপর্যয় মনের উপর যে চাপ তৈরি করে দ্বিতীয় বিপর্যয়ে তা আসে না। বরং প্রথম বিপর্যয়ের প্রবল মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

ছোটনের মৃত্যু রূপা খুব সহজভাবে গ্রহণ করল।

ছোটন ছ'টা সাড়ে ছ'টার দিকে মারা যায় আমি তার মৃত্যুর দু'থেকে আড়াই ঘণ্টা পরের সিনারিও বলি। ঘড়িতে বাজছে আটটা পঁচিশ। আমি বারান্দার চেয়ারে বসে আছি। বাড়িতে পুলিশের ওসি সাহেব এসেছেন। আমার লোকজনও চলে এসেছে (রহমত মিয়া, ইফতেখার মামা, জলিল সাহেব)। গেটের বাইরেও অনেক লোকজন। তারা হৈচৈ করছে। পুলিশ তাদের সরিয়ে দিচ্ছে, তারা আবারো ফিরে আসছে। আমি ঝিম ধরা ভাবে বসে আছি। এমন সময় রূপা আমার কাছে এসে বলল, তুমি এত আপসেট হয়ো না। স্বাভাবিক হও। চা খাবে? চা বানিয়ে দেই?

যে মেয়েটির অতি আদরের ছোটবোন দু'ঘণ্টা আগে মারা গেছে সে কি এত স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে? অবশ্যই পারে না। রূপা পারছে কারণ সে তার সমস্ত অস্বাভাবিকতা বড় বোনের মৃত্যুতে দেখিয়ে ফেলেছে। ছোট বোনের মৃত্যু তাকে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করছে।

তবে এই স্বাভাবিকতা সাময়িক। খুবই সাময়িক। প্রবল শোকের ব্যাপারটা সে এখনো বুঝতে পারছে না, মস্তিষ্ক তাকে বুঝতে দিচ্ছে না। কারণ মস্তিষ্ক মনে করছে রূপা যখনই প্রবল শোকের ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝবে তখনই মস্তিষ্ক নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মস্তিষ্ক চেষ্টা করছে নিজেকে রক্ষা করতে।

রূপা আবারো বলল, তুমি কি চা খাবে? চা বানিয়ে আনব?

তোমাকে চা বানিয়ে আনতে হবে না। তুমি বসো তো আমার পাশে।

রূপা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি এমন অসহায়ের মতো মুখ করে বসে আছ, আমার খুব খারাপ লাগছে।

আমি বললাম, রূপা, তুমি একটা কাজ কর–ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে থাক। তোমার ঘুম দরকার।

রূপা বলল, আমি তোমার পাশে বসে থাকব, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তুমি হাতটা দাও তো, আমি তোমার হাতটা একটু ধরি।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। রূপা আমার হাত ধরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, তুমি এখন আর আমাকে আগের মতো দস্তা-কন্যা বলে ডাক না কেন?

এখন থেকে অবশ্যই দস্তা-কন্যা ডাকবে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

রূপা বলল, আমি ছোটনের গোপন একটা ব্যাপার জানি। গোপন ব্যাপারটা শুনলে তুমি খুবই অবাক হবে।

গোপন ব্যাপারটা কী?

ছোটন তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম। একবার ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করব। তোমার পরামর্শ নেব।

আলাপ কর নি কেন?

তুমি যদি আমার বোনটাকে খারাপ ভাব–এই জন্যে আলাপ করি নি। আমি চাই না কেউ আমার বোনকে খারাপ ভাবুক।

তাহলে ঠিক আছে।

আমি যে তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি তা কি তুমি জানো?

জানি।

কেন ভালোবাসি সেটা জানো?

জানি।

তাহলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো কেন ভালোবাসি। আমি নিজে জানি না। আমার জানতে ইচ্ছা করে।

আরেক দিন বলি। আজ বাড়িতে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। এই সময়ে ভালোবাসা বাসি নিয়ে কথা বলা ঠিক না।

তুমি ঠিকই বলেছ। আচ্ছা শোন, আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছা করছে। আমি কাঁদতে পারছি না। কেন বলো তো?

বলতে পারছি না।

কান্না দেখতে তোমার ভালো লাগে না। এই জন্যে আমি কাঁদছি না। আমি ঠিক করেছি তোমার ভালো লাগে না এমন কোনো কাজ আমি কখনো করব না। ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছি না?

হ্যাঁ, খুব ভালো সিদ্ধান্ত।

এতক্ষণ ধরে আমরা কথা বলছি, তুমি কিন্তু এখনো একবারও আমাকে দস্তাকন্যা বলে ডাক নি।

কেমন আছ দস্তা-কন্যা?

রূপা গাঢ় স্বরে বলল, ভালো আছি। আমি খুব ভালো আছি।

অনেক রাতে আমি ছাদে গেলাম। ডাক্তার সাহেব পেথিড্রিন ইনজেকশান দিয়ে রূপাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। সহজে তার ঘুম ভাঙবে না। আমি দীর্ঘ সময় আকাশ দেখতে পারব। টেলিস্কোপ দিয়ে শখের এনোমারের আকাশ দেখা না, খালি চোখে আকাশ দেখা। আকাশে কোনো কোনো নক্ষত্র উজ্জ্বল, কোনো কোনোটি অনুজ্জ্বল। দীর্ঘ সময় এদের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ সবগুলি নক্ষত্রকে সমান ঔজ্জ্বল্যে দেখতে চেষ্টা করে, তখন মস্তিষ্কে কিছু রি-এরেঞ্জমেন্ট হয়। তার ফল খুব ইন্টারেস্টিং। তখন মনে হয় সব নক্ষত্র হঠাৎ নিচে নেমে আসছে কিংবা যে তাকিয়ে আছে সে ভেসে ভেসে নক্ষত্রের দিকে যাচ্ছে।

যখন আকাশের তারাগুলি আমার চোখের দিকে নামতে শুরু করল তখন অবিকল ছোটনের গলায় কেউ একজন বলল, কী দেখছ?

আমি বললাম, তারা দেখছি। কাঁসা-কন্যা, কেমন আছ?

ভালো আছি। আমি সবসময় ভালো থাকি।

তুমি কোথায়?

আমি তোমার মাথার পাশে, পা ছড়িয়ে বসে আছি।

আমি যদি উঠে বসি তাহলে কি তোমাকে দেখতে পাব?

অবশ্যই দেখতে পাবে। তোমার রোগ অনেক বেড়েছে, কাজেই বেশিরভাগ সময়ই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তুমি যদি আমাকে বলো তোমার পাশে শুয়ে তারা দেখতে, তা হলে আমি তাই করব। তুমি তখন আমার গায়ে হাত রেখেও তারা দেখতে পারবে। কিংবা আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার চোখের দিকেও তাকিয়ে থাকতে পার। চোখের মণিতে তারার প্রতিফলন দেখাটাও ইন্টারেস্টিং হবার কথা।

আমার কাছে তো পুরো ব্যাপারটাই ইন্টারেস্টিং লাগছে। কল্পনার মানুষের বাস্তব উপস্থিতি।

কাঁসা-কন্যা হাসল।

আমি বললাম, হাসছ কেন?

কাঁসা-কন্যা বলল, আমি হাসছি, কারণ, তোমার যে অসুখটা হয়েছে সেটা আসলেই মজার অসুখ। এই অসুখে বাস্তব-অবাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কখনো তোমার কাছে মনে হবে, আমি বাস্তব, রূপা কল্পনা।

আচ্ছা তুমি এখন কার মতো? রূপার মতো না-কি ছোটনের মতো।

তুমি আমাকে যার মতো ভাববে, আমি হব তার মতো।

কাঁসা-কন্যা, আমার পাশে এসে শুয়ে থাক। আস আমরা এক সঙ্গে তারা দেখি।

সে বাধ্য মেয়ের মতো আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, ঐটাই কি সপ্তর্ষিমণ্ডল?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সপ্তঋষির নামগুলি জানো?

অবশ্যই জানি–অড়ু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচ।

অরুন্ধতি নামের একটা তারা আছে না? অরুন্ধতি কোনটা? বশিষ্টের পাশের তারাটি অরুন্ধতি। দেখতে পাচ্ছ?

না।

চোখ খারাপ হলে অরুন্ধতি দেখা যায় না। আমার মনে হয় তোমার চশমা নিতে হবে।

আমাকে চোখের ডাক্তারের কাছে কবে নিয়ে যাবে বলো তো। আমি অরুন্ধতি তারাটা খালি চোখে দেখতে চাই।

নিয়ে যাব। খুব শিগগিরই নিয়ে যাব।

আমি কাঁসা-কন্যার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। তারাগুলি সত্যি সত্যি তার চোখে দেখা যাচ্ছে। বাহ মজা তো!

কাঁসা-কন্যা লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, চোখ বড় বড় করে কী দেখছ?

আমি বললাম, তারা দেখছি। তারাগুলি কি সুন্দর তোমার চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

সে আদুরে গলায় বলল, উদ্ভট কথা বলবে না তো।

আমি বললাম, তুমি যে ধরনের কথা শুনতে চাও আমি ঠিক সেই ধরনের কথা বলব। ভালোবাসার কথা শুনতে চাও?

না।

না কেন?

আমার লজ্জা করবে।

তাহলে কি জ্ঞানের কথা শুনতে চাও? বিজ্ঞানের কথা। সৃষ্টি-তথ্য।

বলো শুনি।

এক্সপানডিং ইউনিভার্সের তথ্য জানো? আদিতে এই মহাজগৎ বিন্দুতে সীমাবদ্ধ ছিল। হঠাৎ কী যেন হলো। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিন্দু পরিণত হলো মহাজগতে এবং সেই জগত থেমে রইল না, চারদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল।

বাহ অদ্ভুত তো!

যে নক্ষত্ররাজি যতদূরে সে তত বেশি গতিতে বাইরের দিকে ছুটছে।

কোথায় যাচ্ছে?

কোথায় যাচ্ছে আমরা জানি না। তবে একটা জিনিস জানি–সবচে’ দূরবর্তী নক্ষত্ররাজি ছুটছে আলোর গতিতে। তাতে একটা বড় সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

কী সমস্যা?

যে বস্তু আলোর গতিতে ছুটে তার কাছে সময় বলে কিছু নেই। ঐসব বস্তু বাস করছে সময় শূন্য জগতে। কাজেই ঐসব বস্তু সম্পর্কে আমরা কোনোদিনই কোনো কিছু জানতে পারব না।

আমি গল্প করছি। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে গল্প শুনছে কাঁসা-কন্যা। আহারে, কী আনন্দময় সময়!

৮. মূল গল্প থেকে একটু সরে যাই

মূল গল্প থেকে একটু সরে যাই? তাতে আপনার নিশ্চয়ই সমস্যা হবে না। একটা ভেরিয়েশনও হবে। প্রকৃতি ভেরিয়েশন পছন্দ করে। দেখছেন না সে। কত বিচিত্র ধরনের গাছপালা, জীবজন্তু তৈরি করেছে! সে যেমন পিপড়ার মতো ক্ষুদ্র প্রাণী তৈরি করেছে আবার দশটা হাতির সমান নীলতিমিও তৈরি করেছে।

মূল গল্পের বাইরের গল্পটা ইফতেখার মামাকে নিয়ে। মনে হয় তার মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে। মানসিক চেইন রিঅ্যাকশান। চেহারা হাবাগোবা টাইপ হয়ে গেছে। মাথা ঝুলে গেছে। থুতনি চলে এসেছে বুকের কাছাকাছি। সাথীর মৃত্যুর ধকল সামলাবার পর তাঁর সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় দেখা। আমি বললাম, মামা, কেমন আছেন?

তিনি জড়ানো গলায় বললেন, ভালো না।

আমি বললাম, ভালো না কেন? কী হয়েছে?

তিনি জবাব দিলেন না। তাঁর মাথা আরো ঝুঁকে গেল। থুতনি সত্যি সত্যি বুকের সঙ্গে লেগে গেল। আমি বললাম, হাত অবশ হয়ে গেছে?

তিনি হ্যা-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, বড় কোনো মিথ্যা কথা বলেছেন?

তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কোনো মিথ্যা কথাই বলি নাই।

আমি বললাম, এক কাজ করুন। হজ্ব করে আসুন। হাত ঠিক হয়ে যাবে। টাকা কোনো সমস্যা না। টাকা দিচ্ছি। আজই দেব। চেক লিখে দেব।

মামা এইবার মাথা তুললেন। স্পষ্ট গলায় বললেন, তোমার টাকায় হজ্ব করব না।

আমি বললাম, কেন করবেন না? আমি খারাপ লোক, আমি খুনি–এই জন্যে?

তিনি স্থির হয়ে রইলেন। হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, মামা শুনুন, আমি খারাপ লোক না। আমি পাগল। পাগলদের অপরাধকে অপরাধ বলে ধরা হয় না। তাদের কোনো বিচারও হয় না। শুধু যে ইহকালে হয় না তা-না, পরকালেও হয় না। শেষ বিচারের দিনেও তাদের বিচার হবে না।

ইফতেখার মামা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু তিনি যে আমাকে পরিষ্কার দেখতে পারছেন তা মনে হলো না। আমি বললাম, আপনার হাতটা ঠিক করা দরকার। যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের দু'টা করে আছে তার একটা নষ্ট হলে অন্যটাও নষ্ট হয়ে যায়। একে বলে সিমপ্যাথিটিক রিঅ্যাকশান। মনে করুন আপনার ডান চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুদিন পর দেখবেন আপনার বা চোখের জ্যোতিও কমতে শুরু করেছে।

ইফতেখার মামা বললেন, হজ্বে গেলে আমার এই রোগ সারবে না। কী করলে সারবে সেটা আমি জানি।

কী করলে সারবে?

তুমি যে মানুষ খুন করেছ এই কথাটা যদি সবাইকে বলি তাহলে রোগ সারবে।

তাহলে তো চিকিৎসা সহজ হয়ে গেল। আপনার যাকে বলতে ইচ্ছা বলুন। পরিচিতদের বললে কিছু হবে না। বলতে হবে পুলিশকে। এক কাজ করুন, এখুনি থানায় চলে যান।

মামা বিড়বিড় করে বললেন, আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না।

কেন?

জানি না কেন।

আমি বলে দেব কেন? আমি বিপদে পড়ি এমন কিছুই আপনি করতে পারবেন না। কারণ আমি একজন সাইকোপ্যাথিক মানুষ। সাইকোপ্যাথিক মানুষরা তাদের চারপাশের মানুষদের এক ধরনের ঘোরের মধ্যে রাখে। তারা এই ঘোর থেকে বের হতে পারে না।

মামা বললেন, আমি যাই।

চলে যাবেন?

মামা জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আপনি আমার বিষয়ে পুলিশের কাছে কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন। আমি কিছুই মনে করব না। আপনার এই রোগ কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে। সর্বাঙ্গ অবশ। জীবন কাটছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। অবস্থাটা চিন্তা করেছেন?

মামা ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু কিছু বলতে পারি নি।

আপনি কী করেছেন? ওসি সাহেবের সঙ্গে এক কাপ চা খেয়ে চলে এসেছেন?

চা খাই নি, চলে এসেছি।

মামা, আপনার কিন্তু পুলিশকে ঘটনাটা বলা দরকার ছিল। শুধু যে আপনার রোগমুক্তির জন্যেই দরকার ছিল তা-না। আমি যাতে এই ধরনের অপরাধ আর করতে না পারি তার জন্যেও দরকার ছিল। আমি তো এই ধরনের অপরাধ আরেকটা করতে পারি।

আরেকটা করবে?

করাটাই তো স্বাভাবিক।

করাটা স্বাভাবিক?

আপনার জন্যে স্বাভাবিক না। কিন্তু আমার জন্যে অবশ্যই স্বাভাবিক। একজন সুস্থ মানুষের জগৎ এবং একজন অসুস্থ মানুষের জগৎ এক রকম না। আপনার রিয়েলিটির সঙ্গে আমার রিয়েলিটির কোনো মিল নেই। মামা, আপনি পুলিশের কাছে যান। এখনই চলে যান। ড্রাইভারকে বলুন আপনাকে থানায় নামিয়ে দেবে। আমাদের এলাকাটা কোন থানার আন্ডারে? রমনা থানা?

মামা জড়ভরতের মতো এগুচ্ছেন। তার হাঁটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি কাউকে কিছু বলতে পারবেন না। ব্যাধি তাঁকে ক্রমে ক্রমেই গ্রাস করবে। আহা বেচারা!

৯. গল্পটা কেমন লাগছে

ভাই, আমার গল্পটা কেমন লাগছে?

রূপকথার গল্পের মতো না? রূপকথার গল্পে দুই রানী থাকে–সুয়োরানী ও দুয়োরানী। আমার গল্পেও তো দুই রানী একজন রূপা, আরেকজন কাঁসা।

রূপকথার গল্প শেষ হয় কীভাবে? শেষ লাইনটি থাকে এরকম—‘অতঃপর তাহারা সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।’

আমিও সুখে দিন কাটাচ্ছি। রূপকথার চেয়েও ভালো আছি।

রূপকথায় শেষপর্যন্ত দুই রানী থাকে না। ভালোটা থাকে, খারাপটা চলে যায়। আমি আছি দু’জনকে নিয়েই। সারাদিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। মাঝে মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি।

গাছের গোড়ায় পানির বদলে রক্ত দেয়ার পরীক্ষাটা শুরু করেছি।

আরেকটা পরীক্ষা করছি বিড়াল দিয়ে। একটা বিড়ালকে অন্ধকার ঘরে আটকে রেখেছি যেখানে সামান্যতম আলোও নেই। আমার দেখার ইচ্ছা দীর্ঘদিন অন্ধকারে থাকার কারণে বিড়াল অন্ধ হয়ে যায় কি-না। কেউ কোনো বাধা দিচ্ছে। না। বরং কাঁসা-কন্যার কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্ছি। বেশিরভাগ সময় সে আড়ালে আড়ালে থাকে। তবে ডাকলেই চলে আসে।

কাঁসা-কন্যার জন্যে আমি একটা নাম খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার জানা সুন্দর নাম কি আছে?

আপাতত একটা নাম ঠিক করে রেখেছি ‘প্লবঙ্গ’। তারার নামে নাম।

ধ্রুবতারার কাছাকাছি একটা তারা আছে, যাকে বলা হয় মেরু প্রহরী (Gurdian of the pole)। এই তারা ধ্রুবতারাকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয় এরকম মনে হয়। পাহারাদার সেই তারার বাংলা নাম প্লবঙ্গ। ইংরেজিতে Kochab.

কাঁসা-কন্যা তো আমাকে পাহারাই দিচ্ছে, কাজেই তার নাম প্লবঙ্গ হতে পারে।

তবে যুক্তাক্ষর দিয়ে শুরু নাম আমার পছন্দ না। সব নাম হওয়া উচিত যুক্তাক্ষর বর্জিত। আমি কাঁসা-কন্যার জন্যে ভালো নাম খুঁজছি। আপনার সন্ধানে থাকলে বলবেন।

রূপাকে একটা হোমে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। সেখানে সে ভালো আছে। খাওয়া-থাকার কোনো সমস্যা নেই। চিকিৎসা চলছে। মানসিক রোগ তো। জীবাণুঘটিত কোনো ব্যাপার না যে এন্টিবায়োটিক দিয়ে সারিয়ে দেয়া যাবে। সাত দিনের কোর্স। প্রতি আটঘণ্টা পর পর দুশ’ পঞ্চাশ মিলিগ্রাম এন্টিবায়োটিক।

কঠিন মানসিক ব্যাধি সারতে সময় লাগে। সবসময় যে সারে তাও না।

রূপা ভালো আছে। বেশ ভালো। সে তার নিজের ঘরে দিনরাত বসে থাকে। ঘর থেকে বের হতে ভয় পায়। শুধু আমি যখন তাকে দেখতে যাই, সে ঘর থেকে বের হয়। আমার সঙ্গে অনেক গল্প করে। তার শৈশবের গল্প। বাবা, মা, ভাইবোনের গল্প। ইউনিভার্সিটির গল্প। গল্প করতে করতে হঠাৎ থেমে যায়। মুখ করুণ করে বলে আমাকে এখান থেকে কবে নিয়ে যাবে?

আমি বলি, খুব শিগগিরই নিয়ে যাব।

আজ নিয়ে যাবে? আমাকে বের করে নিয়ে চল। কতদিন ধরে যে এই ঘরটার মধ্যে আছি!

বেশিদিন তো হয় নি রূপা। মাত্র দু'বছর হয়েছে। মাত্র সাত শ তিরিশ দিন।

আমার কাছে মনে হচ্ছে কয়েক লক্ষ বছর ধরে এইখানে আছি। যেন আমার জন্মই হয়েছে এই ঘরে।

এই তো আর অল্প কিছু দিন। আমি তোমার জন্যে চকলেট এনেছি। চকলেট খাও।

তুমি কি এখন চলে যাবে?

না, আরো কিছুক্ষণ থাকব।

আবার কবে আসবে?

আবার কবে আসব সেটা তো তুমি জানো। আমি প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে আসি।

ভুলে যাবে না তো?

না, ভুলব না। আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো।

আমি জানি তোমার স্মৃতিশক্তি ভালো। কেন জানি আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আমার কিছু মনে থাকে না। তুমি যে প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে আস—এটা আমার মনে ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল তুমি ছয়-সাত বছর পর পর একবার আস।

তুমি যদি চাও মাসে দু'বার আসব।

দরকার নেই, তোমার কষ্ট হবে।

রূপা বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমার চলে যাবার সময় হলেই তার শ্বাসকষ্ট হয়। বেচারি বড় কষ্ট পায়।

রূপার সঙ্গে দেখা করে আমি গেলাম ইফতেখার মামাকে দেখতে। তিনি একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে আছেন। পুরো শরীর অবশ। শুধু মাথা নাড়তে পারেন। কথা বলতে পারেন। তাঁর সেবার জন্যে একজন সার্বক্ষণিক নার্স আছে। নিউরোলজিস্ট প্রফেসার আবিদ তার চিকিৎসা করছেন। ফিজিওথেরাপিস্টও একজন আছেন। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ আমি দিচ্ছি।

মামা আমাকে দেখে খুশি হলেন। তাঁর চোখ ঝলমল করে উঠল। আমি বললাম, মামা, ভালো আছেন?

মামা বললেন, হু। ভালো আছি। তুমি কেমন আছ বাবা?

আমি জবাব দিলাম না। মামার পাশে বসলাম। আমি যে ভালো আছি এটা মামাকে বলতে ইচ্ছা করছে না।

সারাটা দিন আমার নানান কাজকর্মে কাটে। ‘বাংলাদেশের পাখি’ বিষয়ে আমি একটা বই লেখার চেষ্টা করছি। পাখি দেখার জন্যে বায়নোকুলার নিয়ে প্রায়ই আমাকে বনে-জঙ্গলে যেতে হয়। দিনের সময় পাখিদের জন্যে থাকলেও রাতটা আমি রেখে দেই প্রবঙ্গের জন্যে।

আমার রাত কাটে প্লবঙ্গের সঙ্গে গল্প করে। কত বিচিত্র বিষয় নিয়েই না। আমরা গল্প করি! মাঝে মাঝে তাকে কবিতা পড়ে শোনাই। সে মুগ্ধ হয়ে শোনে। তার চোখে ছলছল করে অশ্রু। সে চোখ মুছে গাঢ় গলায় বলে, এই কবিতাটা আবার পড় তো!

আমি আবারো পড়ি

If we shall live, we live;
If we shall die, we die;
If we live we shall meet again;
But to night, goodbye.

রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আগে রূপার ডায়েরির কয়েকটা পাতা পড়ি। কী গুছিয়েই না সে তার আবেগের কথা লিখেছে–

আজ বুধবার। ওকে দেখলাম বারান্দায় বসে আছে। তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ও আকাশ খুব ভালোবাসে। দিনে আকাশ দেখে। রাতেও আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকে। ও যখন একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন আমার এত মায়া লাগে। আমার ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলি–তোমার কিসের কষ্ট বলো তো?

রাতে হঠাৎ যদি আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি উঠে বসি। তাকিয়ে থাকি ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে। আমার মনে হয় আমি আমার বাকি জীবনটা তার মুখের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিতে পারব। আমার আর কিছু লাগবে না।

রূপার লেখা পড়তে পড়তে আমার চোখ ছলছল করে। আমার মনে হয়–আমাদের জীবনটা তো সুখেই কাটছে।